# পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, কলিকাতা, ১৯৬৩

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, পোষ্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১ [প্রকাশক]
লিথন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন,
কলিকাতা ১২ [মুদ্রাকর ]

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে, নাম 'হতাশ প্রেমিক'। ডায়েরির আঙ্গিকে লেখা ঐ গল্পের প্রথম কয়েকটি লাইন এইরকম :

৩১শে চৈত্র। রাত্রি ১০টা।

হে ১৩২৮ সাল! আজ কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? আজ নিশাশেষে, উষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যই কি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে? তোমার পায়ে ধরি ২৮ সাল, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আরও কিছুদিন অবস্থিতি কর—তোমায় যে আমি বুক ভরিয়া ভোগ করিতে পাইলাম না। তাই ২৮ সাল, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমার আসন্ন বিরহে আমায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।······

প্রাণ জৈমিনিরও কেঁদে উঠেছিল। ২৮ নয়, ৬৮ সালের দুঃখে। তাই সে লিখছে :

ভাই ১৩৬৮ সাল !

তুমি আমাদের কাছে চিরবিদায় নিয়ে গেলে। কেন গেলে ভাই? তুমি কি মনে কর, সময় শুধু ঘড়ির কাঁটা, ক্যালেণ্ডারের পাতা, বয়স মাপার নিরিখ? না, তা তো নয়। সে যে শত-সহস্র মানব-মানবীর স্মরণের অম্লান কুসুম, তা কি তুমি জানো না?

কী জানি কেন ফুলের সঙ্গে সময়ের তুলনা দিলাম। হয়তো ফুলের মধ্যে মধু থাকে, সেই ছিল আমার আকর্ষণ। কিন্তু মধুর সঙ্গে মৌমাছি, এবং মৌমাছির সঙ্গে তার হুল যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তা কি আমি ভুলে গেলাম?

না, ভুলিনি। ভাই ১৩৬৮ সাল, তোমার মধু আর হুল, দুই-ই আমার অন্তরে চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল।

আহা, কি সুন্দর ছিল এক বছর আগেকার সেই নতুন বছরের আরম্ভটি। সেদিনও এমনই নিদাঘ-তাপে আইঢাই করছিলাম বটে কিন্তু সেদিন যে আমার এক বছর বয়স কম ছিল। এই কম থাকাটা যে কত বেশী থাকা, তা আমার মতো বিগতযৌবন মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করে।

কিন্তু যৌবন নিয়ে শোচনা করিনে। কে না জানে, আয়ুর মতো যৌবনও পদ্মপত্রে নীর, যতোক্ষণ থাকে সেইটুকুর জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ। আরো বেশী থাকে না কেন, এ নিয়ে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। অতএব যৌবনের কথা থাক। কিন্তু যৌবন যেতে শুরু করলেই গায়ের চামড়া ঢিলে হয়, চুল পাকে, দাঁত পড়ে, এগুলো আমি ভুলে থাকতে পারিনে। কিংবা আমি ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলতে দেয় না। আমার দুঃখ সেইখানেই। ভাই ৬৮ সাল

লোকের কাছে আমাকে হেয় করে তোমার কী লাভ হল ?

জানি, আমার এই বিশেষ চেহারাটিরও কিছু কিছু সুযোগসুবিধে তুমি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রেখেছ। আমি ইচ্ছে করলে এখন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে পারব, আরো বেশী ক'রে সভা-সমিতির সভাপতি হ'তে পারব, এমন কি বিশেষজ্ঞ-রূপে দেশ-বিদেশেও আমন্ত্রণ পেতে পারি। তারপর ধীরে ধীরে আসবে সেইদিন যেদিন আমি নানা উপলক্ষে কাগজে বিবৃতি দেব। লোকে হাততালি দেবে, কিন্তু পড়বে না। আমি হাওড়া ব্রিজ, এসপ্ল্যানেড, কিংবা মেডিক্যাল কলেজের মতো একটা নিত্য-উচ্চারিত নামে পরিণত হব।...কিন্তু আমার যে কান্না পায়। ভাই ৬৮ সাল, তুমি আমাকে জাদুঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে গেলে !

কিন্তু তুমি চলে গেছ, এসব কথা বলে আর লাভ কি ? বরং আমি সেইদিনের কথাই বলি যখন তুমি ছিলে।

ভাই ৬৮ সাল, তুমি জানো না, তুমি কতো মহৎ। কালচক্রের অমোঘ নিয়মে যেদিন পঞ্জিকায় ১২৬৮ সালের আবির্ভাব ঘটে সেইদিনই স্থির হয়ে গেছে তুমি চিরস্মরণীয় হবে। কারণ ঐ বছরেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১২৬৮ সালের একশ' বছর পরে যে তোমাকে আসতেই হবে এ তো সোজা অঙ্ক। তাই রাজার ছেলে রাজা হওয়ার মতো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেছে, ১২৬৮ সালের মতো তোমারও কপালে পড়বে অক্ষয় কীর্তির চন্দন তিলক।

সেই গৌরব তুমি কড়া-গণ্ডায় আদায় করে নিয়ে গেছ। বাঙালী যে এতো রসগ্রাহী জাত, এর আগে তা কে এমন মর্মে মর্মে টের

পেয়েছে বল তো? আমরা দুর্বল, বিপর্যস্ত, অবহেলিত যাই হই না কেন, কলম ধরতে ভয় পাইনে। বরং কলম দেখলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি। ভাই ১৩৬৮ সাল, একবার চিন্তা করে দেখ, গত এক বছরে কতো প্রবন্ধ আমরা লিখেছি! সত্যি বললে, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, বাঙালীর ছেলে আর যাতেই ভয় পাক, প্রবন্ধ লিখতে ভয় পায় না। বিশেষ করে, বিষয়টা হয় যদি রবীন্দ্রনাথ। ভূমা, জীবনদেবতা, আপন মনের মাধুরী ইত্যাদি কথা এমন সহজে আমাদের কলমে আসে যে, নিজেরাই আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যাই। বাস্তবিক, বীজগণিতের ফর্মূলার মতো একেও এক ধরণের রবীন্দ্র-বোধ ফর্মূলা বলা যেতে পারে। এই ফর্মূলা আমরা বাল্যকাল থেকে এমনভাবে রপ্ত করেছি যে অন্য কথা ভাববারই দরকার কোনো করে না। এবং ভাবিও না। তুমিই বল ৬৮ সাল, কষা অঙ্ক নতুন ফর্মূলায় কষতে গিয়ে একটা গোলমাল করে ফেলা কি খুব গৌরবের কথা হতো?

তাছাড়া, তুমি তো জানো, নতুন করে ভাবতে গেলে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে পড়া আমাদের অনেকেরই হ'য়ে ওঠেনি। আর তার সময়ই বা কোথায়? আমরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ বা রাজনীতিক। সারাদিনই আমাদের কাজ। এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ পড়তে বসলেই হ'য়েছে আর কি! তাহলে আর বক্তৃতা দেব কখন? লিখব কখন? আমরা তাই কয়েকটা সরল রাস্তা বার করেছি। একটা তো আগেই বলেছি, ভূমা + জীবনদেবতা × আপন মনের মাধুরী = রবীন্দ্রনাথ। আরো কয়েকটা নীচে তুলে দিচ্ছি।

১। রামমোহন + দেবেন্দ্রনাথ + উপনিষদ + বৈষ্ণব কবিতা ×

ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা – আধুনিক যন্ত্রণা = রবীন্দ্রনাথ।

২। রবীন্দ্রসঙ্গীত = ( ধ্রুপদ + বাউল ) ÷ পাশ্চাত্য সঙ্গীত।

৩। রবীন্দ্রচিত্র = আধুনিক মন + কবিতার খসড়ায় কাটাকুটি × অবচেতন মনের অসুন্দর ÷ অবদমন।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাই ১৩৬৮, তুমি গেছ, কিন্তু যে সব অমূল্য শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছ সেজন্যে তুমি আমাদের ধন্যবাদ জেনো। একশ' বছর পর ১৪৬৮ সালে আবার লোকে তোমার কথা স্মরণ করবে। এবং তোমার ৩৬৫ দিনের সামান্য আয়ুতে কী অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তিরিশ হাজারটি প্রবন্ধের জন্মদান সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে ভেবে কূলকিনারা পাবে না। সেই জন্যেই আমি উপরে কয়েকটি ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। আশা করি, রবীন্দ্রজন্ম-দ্বিশত-বার্ষিকীর লোকেরা এ জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।

ভাই ১৩৬৮ সাল, আমার কামান নেই. তোমার সম্মানে আমি একুশবার নমস্কার জানাচ্ছি। বিদায়, চিরবিদায়!

## ॥ দুই ॥

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেল, কলকাতা থেকে নাকি মাছির বংশ লোপাট করে দেওয়া হবে। এ জন্যে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত হয়েছে। তার কর্মকর্তারা অচিরাৎ কাজ আরম্ভ করবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য মাছির জন্মস্থান—শহরের আবর্জনাসঙ্কুল জায়গাগুলো পরিদর্শন করবেন তাঁরা : তারপর হয়তো তৈরী করবেন রিপোর্ট ; এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা প্ল্যানিং : প্ল্যানিঙের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ ; এবং···ইত্যাদি।

মাছির বংশ ধ্বংস হবে।

হয় যদি, তার চেয়ে সুখের আর কী আছে ? কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে আমরা জেনে আসছি—

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।

সে ছড়াটি তাহলে অর্ধসত্যে পরিণত হবে, মশা থাকলেও মাছি থাকবে না। এবং মাছি থাকবে না বলে মাছিমারা কেরানীও বোধহয় থাকবে না। কিন্তু সে সবই ভবিষ্যতের কথা। তার আগে ঐ পরিদর্শন, রিপোর্ট, প্ল্যানিং, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি ধাপগুলো পার হ'য়ে আসা চাই। কাজেই—!

ইতিমধ্যে অবশ্য একটা বড় খবর জানা গেছে মাছির বিষয়ে। জানিয়েছেন ঐ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরই জনৈক কর্মকর্তা।—

একজোড়া মাছিকে যদি অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয় তাহলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দাঁড়াবে—১৯১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। ( সংখ্যাটি উচ্চারণ করতে অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়ই ? এটা হল— উনিশ লক্ষ দশ হাজার কোটি কোটি ! )

এই জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্মত অঙ্কটির জন্যে ধন্যবাদ। এর দ্বারা আমিস্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ছোট জিনিসের জোর কতো বেশি।

চার পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে একজোড়া হাতির একটিও বংশবৃদ্ধি ঘটত না, কিন্তু মাছির বেলায় কোটিকোটির খেলা। ঠিক যেন পারমাণবিক শক্তি!

ভাবতে অবাক লাগে, একদা যখন মানুষ বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে শত্রুনিপাত করত তখন তার আয়োজন ছিল কতো বিরাট, অথচ সিদ্ধিলাভ ঘটত কতো সামান্য। তারপর সেই পাথরের যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ-তামা-লোহার শিক্ষানবীশীর পর আজ সে আবিষ্কার করেছে শক্তির মূল রহস্য। ছোট্ট একটি পরমাণুর মধ্যে দেখতে পেয়েছে বিশ্ববিধ্বংসী ক্ষমতা। কিন্তু তার প্রতিপক্ষও এতদিন চুপ করে বসে নেই। প্রাচীন যুগের অধিবাসী সেইসব বিশালকায় ম্যামথ-ডায়নসর আজ ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে জাদুঘরে স্থান নিলেও, তাদেরই জায়গা নিয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মশামাছির দল। পারমাণবিক যুগের 'পারমাণবিক' শত্রু! শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার জন্যে যেন এক নতুন শক্তির সমাবেশ!

বাস্তবিক, মাছি যে কী পরিমাণ শক্তিধর প্রাণী তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। কলেরা-বিস্তারের কথা ছেড়ে দিলাম, সে চিন্তা করুন যোগ্যতার ব্যক্তিরা. সাহিত্যিক হিসেবে মানুষের উপর মাছির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথাই আমি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই।

সকলেই জানেন, মাছি অতি বুদ্ধিমান প্রাণী। পশু জগতে যেমন শেয়াল, কীটজগতে তেমনি মাছি। একটা মাছিকে ধরবার চেষ্টা করে দেখবেন, শূন্যমুঠিই ফিরে পাবেন বারে বারে। অথচ সেই মাছিটাই যদি ইচ্ছে করে। সত্যিই কোন কোন মাছি এমন ইচ্ছে

করে!) তাহলে ঠিক আপনার নাকের ডগায় বারে বারে বসে আপনাকে যৎপরোনাস্তি নাকাল করতে পারে। আর সত্যি, মশা বা মাছি মারতে কামান দাগার কথা অত্যুক্তির মতো শোনালেও, এসব সময়ে তেমন একটা অঘটন ঘটালেও যেন মনের জ্বালা মেটে না।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে মাছি খুব গোঁয়ার প্রকৃতির জীব। বরং আমার মনে হয়, পরিহাস-প্রিয়তাই মাছির মজ্জাগত স্বভাব। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরটার সঙ্গে কয়েকটা মাছি দলবদ্ধভাবে কী প্রবল ইয়ার্কিই না শুরু করেছিল একদিন। এখানেও অবশ্য তাদের আক্রমণস্থল ছিল কুকুরটির নাকের ডগা। কুকুরটি ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে সামনের পা দিয়ে নাক মুছে মাছি তাড়াবার চেষ্টায় বিফল হ'য়ে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হা করে মাছি ধরবার জন্যে হাওয়া কামড়াতে লাগল পাগলের মতো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কুকুরটাকে নিয়ে খেলা করাই ছিল মাছিগুলোর একমাত্র আনন্দ।

জানিনে, আমরা যারা এখন মাছির বংশ ধ্বংস করার জন্যে দ্বিতীয় চাণক্যের মতো উঠে-পড়ে লেগেছি, তাদের জন্যেও মাছিরা কী ঠাট্টা জমা রেখেছে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে।

মাছিরা কলকাতার আদিম অধিবাসী। মানুষ আসার আগে থেকেই তারা বাস করছে এখানে। এ শহরের মানুষদের তারা বংশপরম্পরায় চেনে। যে কোন নতুন জিনিস নিয়ে এই মানুষগুলো কেমন শিশুর মতো মেতে উঠতে পারে তা যেমন মাছিরা জানে, তেমনি জানে সেই মানুষদের মজ্জাগত বৃদ্ধের ঔদাসীন্য—আরম্ভ করে শেষ করার ক্ষমতার অভাব। কাজেই—

কাজেই আর কী! মাছিদের পাখা আছে। সম্মুখ যুদ্ধে সামান্য কিছু হতাহত হবার পরই তারা বিমানবাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আত্মগোপন করবে নিরাপদ দূরত্বে। তারপর শহরবাসী আমরা যেহেতু অসংশোধনীয় রকম নোংরা, আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান যেহেতু ক্রনিক বিশৃঙ্খলার পীঠস্থান, সেইহেতু নতুনত্বের টাটকা উত্তেজনা থেমে গেলেই আবার তারা ফিরে আসবে পরম আহ্লাদে। এবং প্রতি জোড়ায় উনিশ লক্ষ দশ হাজার কোটি কোটি করে বংশবৃদ্ধি করে সংখ্যাবিজ্ঞানীর চিন্তার খোরাক জোগাবে।

অবশ্য ইতিমধ্যে কাজ যা হবার তা হবেই। তদন্ত, কমিশন, প্ল্যানিং, বাজেট ইত্যাদি চলবেই। অফিসার, এক্সপার্ট, ফাইল ইত্যাদিও বাড়তে থাকবে। এবং আরো বাড়াবে কেরানী। মাছি যা মারার মারবে তা শুধু ওরাই! কিন্তু বাস্তবের মাছি, যে মাছি মহামারী ছড়ায়, তার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটবে না তাতে। ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে একেবারে আমাদের ঈশ্বরপ্রাপ্তির সময় পর্যন্ত এই কালজয়ী মাছির সঙ্গেই অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেই জীবন কাটাতে হবে আমাদের। কলকাতার ঐতিহ্য অটুট থাকবে।

## ॥ তিন ॥

একখানি চিঠি পেয়েছি। নীচে হুবহু ছেপে দিলাম। এ চিঠির বক্তব্য বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই, শুধু এর লেখকের বিষয়ে

এইটুকুই জানাতে পারি যে, ইনি আমার আশৈশব বন্ধু এবং ইদানীং একটি বড় সদাগরী অফিসের মেজো অফিসার। ছাত্রজীবন থেকেই এঁর কালচারের দিকে ঝোঁক ছিল এবং বন্ধুমহলে ইনি ইন্টেলেকচুয়াল বলে খাতির পেতেন।

ভাই জৈমিনি, তুমি এখনো সাহিত্য নিয়ে আছ জেনে ভারি মজা লাগল। মনটা এখনো বিশের কোঠায় আটকে রেখেছ দেখছি। স্বর্গরাজ্যে উর্বশী ছিলেন অনন্তযৌবনা, আর এই মাটির পৃথিবীতে তুমি। কিছুতেই বয়স বাড়তে দিলে না। সন্দেহ হয়, তুমি বোধ করি সশরীরেই স্বর্গলাভ করেছ। নাহলে তোমার বুকের মধ্যে চীৎকার শুনতে পাইনে কেন? জীবনটা যে হিড়হিড় করে তোমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কি তুমি সচেতন নও! নাকি সবটাই তোমার সাজানো? বুঝতে পারিনে। কিন্তু তোমার এই সুবোধ বালকের মতো গোবেচারা ভাব যে আমার দুচোক্ষের বিষ তা আমি অকপটেই স্বীকার করছি। তোমাকে আমি আঘাত করতে চাই, জাগিয়ে তুলতে চাই। দোহাই তোমার, এবার একটু সাবালক হও।

সেদিন পিকনিকে যাবার কথা বললাম, তুমি রাজি হলে না। উল্টে আমাকেই তুমি বললে ছেলেমানুষ। কেন বল তো? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে মাঝে মাঝে আমাদের শহরের বাইরে যাওয়া দরকার, ওয়াইলড হওয়া দরকার? পোষমানা ভদ্রজীবনে তুমি এতোই অভ্যস্ত যে তার ব্যতিক্রম কল্পনা করলেই তোমার হেঁচকি ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যাওয়া, একটু প্রাকৃতজনের সংস্পর্শে

আসা. একে আমি কিছুতেই ছেলেমানুষি মনে করতে পারিনে।

আমি জানি, তুমি এক্ষুনি সোমেন-বিভূতিদের কথা বলবে, লিলি-নন্দা এদের কথা উল্লেখ করে বাঁকা হাসি হাসবে। সোমেনরা যে কিছুটা মূঢ়, তা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু খাদ্যের মধ্যে ঝাল নুনের মতো আড্ডাটাকে দলেও দু-একটি মশলাদার লোক না হলে চলবে কী করে? আর [illegible] বেবো! দেখ, তোমাদের ঘোমটা-টানা [illegible] ঠাকরুণদের আমি বাড়িতে বসে সাতবার নমস্কার জানাব, কিন্তু বাইরে? [illegible] আমরা যে বেঁচে আছি এটা বোঝবার জন্যেই লিলি-নন্দা ধরনের মেয়েদের দরকার। কী ব্রিলিয়ান্ট [illegible]! [illegible] ওরা দলে না থাকলে আর [illegible] দিয়ে চা [illegible] করে খাওয়া একই জাতের জিনিস। অ্যাবসোলিউটলি বোদা, টেস্টলেস্।

বিশেষ করে [illegible]। একটু বেশী হাসে, বেশী কথা বলে, কিন্তু জমাতে পারে দারুণ। আর এমন [illegible]। জানো, সেদিন [illegible] গিয়ে ওপেয়ার। [illegible] উঠে এমন করে দোল খাচ্ছিল যে সকলেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলুম। ওর যে বয়স হয়েছে, শরীর ভারী হয়ে গেছে, সে যেন ওর খেয়ালও নেই। গাছের ডালে দুলতে দুলতে ও গান ধরল, কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু কী বলব, মনে হচ্ছিল যেন আস্ত একটা [illegible] ছবি দেখছি।

তারপর সন্ধ্যে হয়ে আসতে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। লোকে ওকে শ্যালো বলুক, বেহায়া বলুক, কিন্তু ও যে কত বড় একজন রোমান্টিক মেয়ে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেলুম সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতেই। বাগানবাড়িটার চারদিকে অজস্র ঝোপঝাড় ছিল সে তো বুঝতেই

পারছ। সন্ধ্যের সময়ে দলে দলে শেয়াল ডেকে উঠল সেখান থেকে। আর লিলি, বললে বিশ্বাস করবে না, পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে অবিকল প্রতিধ্বনি তুলল শেয়ালের ডাকের। ওব ঐ ঊর্ধ্বমুখী ডাকে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠেছিল সেদিন। পারলে আমবা সকলেই শেয়াল হয়ে ওর ডাকের সাড়া দিতুম। সামান্য একটা শেয়ালের ডাকে যে এমন একটা আবহ রচনা করা যায়, কোনোদিন ভেবে দেখেছ তুমি! যাই বল তোমরা, লিলিকে আমি একজন বড় আর্টিষ্ট বলে স্বীকার করবই। সে শিল্পী, মানব-হৃদয়েব শিল্পী। আব এ কথা আমি তাকে জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো, পিঙ্ক মিস্টারটাও রাতারাতি ইনটেলেকচুয়াল হয়ে উঠেছে। শুনলাম নাকি সেও খুব সমজদার হয়ে উঠেছে লিলির ট্যালেন্টের। এ সব ভড়ং আমাব দুচোক্ষের বিষ। দেব একদিন এমন এক্সপোজ করে ওর বউয়ের সামনে, বুঝবে তখন ঠেলা।

বুঝতে পারছি, তুমি এতে বাধা দিতে চাইছ। তোমার ভয়, পাছে পিঙ্কও আমার বউয়ের কাছে লাগিয়ে দেয়। না, সে আশঙ্কা নেই। ওদিকে আমি আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছি।

বুলা জানে আমি কী প্রকৃতিব মানুষ। স্বামী হিসেবে আমি কিছুই লুকোইনি তার কাছ থেকে। তুমি তো জানো আমি মাঝে মাঝে 'বার'-এ যাই। বুলাকে আমি গোপন করে যাইনে। কারণ সে জানে, কিছুতেই আমাব এসে যায় না। কিছুই আমার অন্তর স্পর্শ করে না। আমি বার-এ যাই, ড্রিংক করি, রেস খেলি, হারি—কিন্তু ভিতরটা আমার শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। কিছুই আমাকে বাঁধতে

পারে না, তৃপ্তি দেয় না। কোনো মেয়ে যদি আমাকে তৃপ্তি দিত, বুলা বোধহয় বেঁচে যেত। আমাকে নিয়ে তার কী যে ভয়, সে যদি তুমি জানতে? বলতে কি, আমার সম্বন্ধে বুলার এই ভয়টুকুই যা আমার সঞ্চয়। আর কোথাও কিছু অবলম্বন পাইনে।

কিন্তু তাই বলে যদি তুমি মনে কর আমি হেরে গেছি তাহলে ভুল করবে। আমি হারিনি, লড়াই করে যাচ্ছি। আমি শেষ না দেখে ছাড়ব না।

ভাই জৈমিনি, কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি মদ খাওয়ার বিষয়ে দিব্যি একটা রম্যরচনা লিখেছিলে। তাতে ইনিয়ে বিনিয়ে বাঙালী যুবকদের মদ্যাসক্তির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে। তোমার ঐ শৈশব-সাধনা আমি হেসেছিলুম। তোমার মতো ওয়াণ্ডারফুল 'ফুল' আমি দেখিনি!

মদ খাওয়াটা অন্যায় কিসে? অন্যায় বলে তারা, যারা পায় না। আর একদল আছেন, যারা জন্ম-জ্যাঠামশাই। উপদেশ দেওয়াই তাদের পেশা। এদের মতে চললে সংসারটা ঋষির আশ্রম হয়ে যেত। কিন্তু গত চার হাজার বছরেও যখন তা হয়নি, তখন ও-নিয়ে ভাবনা করাটাকে নিছক পণ্ডশ্রমই মনে করি আমি। যার খুশি খাবে। পেলেও খাবে, না-পেলেও খাবে। একবার বোম্বাই শহরে ঘুরে এলেই বুঝতে পারবে 'না-পেলে' কেমন করে খায় খানেওয়ালারা।

যাক এসব কথা। আমি নিজের হয়ে কিছু সাফাই গাইছি নে। সে দরকার আমার নেই। কারণ আমার বিবেক অত্যন্ত পরিষ্কার। শুধু দুঃখ হয় তোমার এবং তোমাদের জন্যে। উপকথাবর্ণিত সেই

সেই বিশেষ জীবটির মতো নাগালের বাইরে সমস্ত আঙুরই তোমাদের কাছে টক হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক তুমি কী হারাইতেছ তা তুমি জানো না।

একটা কক্‌টেল পার্টি আছে পরশু। আসবে? লিলিও আসবে, আলাপ করিয়ে দেব। আর আসবে লিজা, আমার 'নিউ ফাইণ্ড'। বিলিতি সুরে বাংলা গান গাইবে সে, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তুমি হাসছ না? ওহে তোকারাম, জীবনটা যে পার হয়ে যাচ্ছে সেটা খেয়াল আছে? এনজয় কর, ধরো জীবনটাকে, তার শাঁস শুষে নাও। কুইক্, কুইক্, কুই...!

ভালোবাসা জানাই। ইতি তোমাদের বাহুল।

## ॥ চার ॥

নিচের চিঠিখানি পরিচয়-পত্রের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া চিঠির ভিতরে যতোটুকু জানা যায়, তার বেশী আমি জানিও না লেখকের সম্বন্ধে: পাঠক নিজগুণে যা হয় বুঝে নেবেন।

প্রিয় জৈমিনি মহাশয়, বাংলা আমার ভাল আসে না। তবু বাংলাতেই লিখছি, কারণ রাহুল জানিয়েছে আপনি সাহিত্যিক। ইংরেজীতে আপনার মনে বিরূপ ভাব জাগতে পারে। সেজন্যে মাতৃভাষার স্মরণ নিলাম।

রাহুল আপনার বন্ধু। তার চিঠি আপনি 'কাগজে' ছেপেছেন।
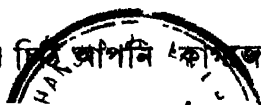
কিন্তু ঐ চিঠি দেখে মনে হল সে আপনার বন্ধুর চেয়েও কিছু বেশী। অন্তত তার তাই হওয়ার ইচ্ছা—গ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। ভালো কথা। আমার তাতে কোন ঝগড়া ছিল না। কিন্তু ঐ চিঠিতে সে আমার নামও উল্লেখ করেছে, আমার ডাকনাম। তাইতেই কিছুটা অসুবিধে হয়েছে। নয়তো কে কাকে কী লিখল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না।

সত্যি বলতে কি, বাহুল যে আমাকে পিঙ্ক মিত্তির বলে উল্লেখ করেছে এতে তার হীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। বিলেত যাবার আগে ও-নামটা আমার চালু ছিল বটে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর সকলেই আমাকে মিষ্টার মিত্র বলে ডাকে। বাহুলেরও তাই উচিত ছিল। অন্তত আমার ভদ্র-নাম পিনাকীও সে বলতে পারত। তা না বলে সে যেভাবে আমার উল্লেখ করেছে তাতে তার অত্যন্ত মীননেস প্রকাশিত হয়েছে। এর পর আমি যদি বলি, সে আমার সম্বন্ধে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে, আশা করি সে আপনার 'বন্ধু' হলেও আপনি তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না।

কিন্তু, আচ্ছা বাহুল কি সত্যি আপনার বন্ধু? কিছু মনে করবেন না, ওর মতো একটা জ্ঞানহীন মূর্খ যে আপনার বন্ধু হতে পারে, আমি ভাবতে পারিনে।

অন্য কথা ছেড়ে দিলাম, যে চিঠিখানি আপনি ছেপেছেন তার মধ্যেও যে সব উচ্চমার্গের বাগাড়ম্বর দেখতে পেলাম তাতে গা-জ্বালা করে। আমি হলপ করে বলতে পারি, যে সব কথা ও বলেছে তার মানে কী তাই ওর বোধগম্য নয়। মদ, রেস ইত্যাদি নিয়ে অনেক নাটুকেপনা করে ও বলছে, কিছুতেই ওর কিছু এসে যায় না, কিছুই

ওর অন্তর স্পর্শ করে না। কী লায়ার দেখুন, দু-পেগ হুইস্কির লোভে বড়লোক বন্ধুদের বাড়িতে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, রেসের মাঠে দশ টাকা চোট খেলে ওর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়, ও বলে কিনা কিছুই ওর অন্তর স্পর্শ করে না!

আসলে ও একটা হিপোক্রীট, এবং হ্যাংলা। ছেলেবেলায় কবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উপরে একটা ইস্কুলমার্কা প্রবন্ধ লিখেছিল, সেই থেকে ওর ধারণা হয়েছে ও মস্ত বড় একজন ইনটেলেকচুয়াল। কিন্তু তারপর কতো জল গঙ্গায় বয়ে গেছে সে খেয়ালই ওর নেই। এখন ওর কাজ হল হাই সোসাইটির আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার তলানী যা কিছু জোটে তাই রাস্তার ময়লা কাগজ কুড়ানো লোকগুলোর মতো মনের মধ্যে বস্তাবন্দী করা। একেই বোধ হয় সাধুভাষায় আপনারা বলেন পল্লবগ্রাহিতা। কিন্তু ওর ঐ সাজানো ময়ূরপুচ্ছগুলো এতোই নড়বড়ে যে চলতে গেলেই খসে খসে পড়ে।

ওর যে কিছু ভাল লাগবে না তাতে আর বিচিত্র কী! ও শুনেছে, ভালো না লাগাই এখন ইউরোপের চলতি হাওয়া। ও বোধ করি আরো অনেক কথা শুনেছে, যেমন ধরুন এগজিস্টানশিয়ালিজম। কিন্তু কথাটার মানে কী তাই বোধ হয় ও জানে না। তবে হ্যাঁ, বাংলাটা জানে। আগে বলত অস্তিত্ববাদ, কিন্তু যেই শুনল কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী কোথায় নাকি লিখেছেন অস্তীতিবাদ, অমনি লুফে নিল কথাটা। এখন ও দম-নেওয়া কলের পুতুলের মতো বলে যাচ্ছে অস্তীতিবাদ, অস্তীতিবাদ। সাধে কি আর লিসি ওর কথা শুনলে এতো হাসে!

কিন্তু জানেন. ওটা এমন বোকা, লিলি যে হাসে তাও ও টের পায় না। ও মনে করে হাসিটা লিলির পুরস্কার। কোনটা পুরস্কার আর কোনটা তিরস্কার সে ভেদরেখাটাও লুপ্ত হয়ে গেছে ওর কাছে।

কিন্তু যা বলছি। রাহুলের বিষয়ে আমার সবচেয়ে বড় আপত্তি হল, ও একটা মানুষই নয়, ভূতুড়ে খোলসমাত্র। অস্তীতিবাদ নিয়ে ও এতো সোৎসাহে নাচে, কিন্তু ওর নিজের অস্তিত্বটাই ওর কাছে সবচেয়ে ফাঁকা ব্যাপার একদিন ওর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছিল, দেখলাম কথায় কথায় সার্ত্রে কামু আওড়াতে লাগল, নিজে কিছুই বলতে পারল না। আমি জিগেস করেছিলাম, তোমার আঁগাজমা কী? ও এমন ভাবে চেয়ে রইল যে ওকে রাস্তার খাবের দোকান-ওয়ালার চেয়েও করুণ দেখাল। আঁগাজমা কথাটাই ও শোনেনি কোন দিন, সেটা যে ইংরেজী এনগেজমেন্টের ফরাসী সংস্করণ তাও ও জানে না।

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! ও ব্যক্তি, কিন্তু ওর কোন এন-গেজমেন্ট নেই। অন্তত সে বিষয়ে ও সচেতন নয়। অথচ অস্তীতিবাদ আওড়ায়। আপনি যে ওর সঙ্গে মেশেন কী করে সেই ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি!

অস্তীতিবাদ' বাংলাটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে!' আমিও মানি। আর মানি বলেই আমি আঁগাজমা খুঁজি। আমি জানি ব্যক্তি হিসেবে আমি একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু আমি সমাজে বাস করি। কাজেই সমাজের সঙ্গে আমার কতকগুলো পয়েন্ট অব কনট্যাক্ট দরকার। সেইটেকেই বলি আমরা আঁগাজমা। রাহুল এ সব

কিছু বোঝে না। অথচ বার-এ যায়, পিকনিক করে, মেয়েদের সঙ্গে মেশে। কী মূর্খের মতো বেঁচে আছে ও, ভাবুন তো আপনি?

ও-সব ব্যাপার আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি কেন আছে। সেটা হল আমার আঁগাজমা, সমাজের সঙ্গে পয়েন্ট অব কনট্যাক্ট। এই জানাটা যে কতোটা মনে জোর এনে দেয় তা যদি বাহুল জানত তবে আর সে এমন ক্যা ক্যা করে বেড়াত না। আনন্দের লোভে হন্যে হয়ে উঠত না।

আপনি তো সাহিত্যিক, ওর চিঠিখানা ভাল করে পড়লেই দেখবেন তার প্রত্যেকটি অক্ষরের আড়ালে ওর লালসাকাঙাল চোখ চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠছে। কিন্তু যে লোক প্রকৃত ইনটেলেক-চুয়াল তার এমন হবে কেন? হাই সোসাইটিতে ওঠা এত সহজ নয়। সেখানে আত্মাকে বিবিক্ত রাখতে হয় সরিয়ে রাখতে হয়। তখন ফুর্তি আর ফুর্তি থাকে না যৌবনের সার কথা তখন হয়ে দাঁড়ায়-ঈট, ড্রিংক অ্যাণ্ড বি গ্লুমি!

বাস্তবিক বাহুলের জন্যে সামান্য দরদ হয়। উচ্চ-বর্ণের অ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজে আসন পাওয়ার জন্যে কতোই না ধরপাকড় খেল ও। কিন্তু বোকাটা জানে না, সেটা এমন এক মিউজিক্যাল চেয়ার, যাতে স্থান সংগ্রহ করা সকলের বরাতে ঘটে না। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় হুল্লোড় করেও যে-মিড্‌ল ক্লাসের মানুষ ও, সেই মিড্‌ল ক্লাসেই পড়ে রইল, আমাদের কাছে পাত্তা পেল না। সিংহ-চর্মধারী গর্দভ আর কাকে বলে!

আজ আর বেশী নয়। এ চিঠি যদি ছাপেন, আমার কাছে দুখানা

অফ-প্রিন্ট পাঠাবেন। বাহুল আর লিলিকে দেখাব। ওর একটু দুঃখ পাওয়া দরকার।

নমস্কারান্তে বিনীত
পিনাকী মিত্র।

## ॥ পাঁচ ॥

কলেরা উপলক্ষে আমাদের পাড়ায় একটা মিটিং হ'য়ে গেল সেদিন। [illegible] উদ্যোক্তা ছিল [illegible] কর্মিবৃন্দ। এরা [illegible], লাইব্রেরী চালায়, [illegible] করে, আবার কলেরা এপিডেমিক শুরু হলে (প্রতি বছরই হয়) ডাক্তারী পড়া ছেলেদের নিয়ে ভলান্টিয়ার দল তৈরি করে ইনজেকশান দেওয়ারও ব্যবস্থা করে।

এদের প্রতি আমরা, অর্থাৎ বড়রা, বেশ স্নেহপরায়ণ। কাজেই এরা যখন কলেরার উপর একটা পাড়া[illegible] মিটিং ডেকে বসল, হাজির হলাম আমরা অনেকেই।

সভার সূচনায় ক্লাবের সেক্রেটারি নীতীশ প্রস্তাব করল, 'আজকের সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে শ্রী[illegible] কালুদার নাম উত্থাপন করছি। সকলেই জানেন, কালুদা আমাদের পাড়ার একজন প্রবীণ বাসিন্দা। তাছাড়া তিনি বাস করেন বস্তিতে। আজকের সভায় তাঁর সভা-পতিত্বই সবচেয়ে বিফিটিং, অর্থাৎ কিনা মানানসই।'

কথাগুলো মিথ্যা নয়। কালুকে আমরা সকলেই চিনি। বস্তির গায়ে তার একটা ছোট মুদিখানা আছে, হঠাৎ দরকারে সেখান থেকে দু'চার পয়সার জিনিসপত্রও কেনা হয় আমাদের অনেকের বাড়িতেই। তাছাড়া কলেরা যখন প্রধানত বস্তিরই সমস্যা তখন এ মিটিঙে কালু সভাপতি হবে এইটেই তো স্বাভাবিক। সকলে সম্মত হলেন।

কিন্তু কালুর কাছে এটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হল না। ঘোরতর লজ্জায় সে 'না না' বলতে লাগল। অবশেষে সকলের অনুরোধে সে রাজি হল বটে, কিন্তু সভাপতির জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসল না। যেখানে ছিল সেখান থেকেই সভাপতির কাজ চালাতে লাগল।

অবিশ্যি, সব সভাতে যেমন এ সভাতেও তেমনি, সভাপতির কাজ চলল উদ্যোক্তাদেরই ইঙ্গিতে। তাদের নেতা হিসেবে নীতীশই বলে দিতে লাগল এটা-ওটা। ক্লাবের হেলথ সেক্রেটারী বিজন ডাক্তার তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন প্রথমে:

'কলেরা একটা ডেনজারাস ডিজিজ, আর খুব ছোঁয়াচে, বুঝলেন। মানে বাড়িতে কারো হলে আর সকলেরও হয়। অবিশ্যি সকলেরই হবে এমন কথা নেই। হয়ও না। তবে পসিবিলিটি থাকে। একটা আতঙ্ক। সেইজন্যে কারো কলেরা হলেই তাকে হাসপাতালে ট্র্যান্সফার করা উচিত। অবিশ্যি হাসপাতালেও রুগী মরে। মরছেই। কিন্তু বাঁচার একটা চান্স থাকে। মানে, আমি বলছিলাম, শহরে তো এখন কলেরা লেগেছে, আমাদের সাবধানে থাকা উচিত। হ্যাঁ, সাবধান। যা-তা না খাওয়া, কলেরার ইনজেকশান নেওয়া,

পরিমাণ জল ব্যবহার করা। তা আমাদের এই পাড়ার ছেলেরা ব্যবস্থা করেছে ভাল। আমি তো এপর্য্যন্ত একটাও কলেরার রুগী পেলাম না। (সভাস্থলে চাপা হাসি।) না না, তার জন্যে আমি হতাশ নই. সুখী, আই এ্যাম ভেরী গ্ল্যাড ফর দ্যাট। ইয়ে, আর কী বলব বলুন! সবই তো আপনারা জানেন।'

তিনি বসলেন। অশোক দত্ত ডাক্তারী পড়ে, ভলান্টিয়ার দলের নেতা। এবার তার পালা। সে বলল :

'আমরা ইনজেকশন দিয়েছি ২০ জনকে। বাড়িতে ৭ জন, বস্তিতে ১১ জন, রাস্তায় ৫ জন। কালুদা এখানে আছেন, ভালোই হল, বস্তির লোকজনেরা বড় বেসিষ্ট করে—নিতে চায় না ইনজেকশান। এটা তাঁকে দেখতে হবে। ইনজেকশান মানে জীবন—না নিলে মৃত্যু। কোনটা চাইব আমরা, জীবন না মৃত্যু? (কানে কানে ইতিমধ্যে নীতীশ কী যেন বলল।) আর হ্যাঁ, খাওয়ার জল ফুটিয়ে নিতে হবে। কলেরা আসে জলের ভেতর দিয়ে। ফোটালে সব মরে যায়—মানে কলেরার বীজাণু।...কলেরাকে আমরা রুখবই, এ পাড়ায় ঢুকতে দেব না। এটাকে একটা আদর্শ হিসাবে তুলে ধরব। (হাততালি) আমাদের পাড়ার একটা ঐতিহ্য আছে। বড় বড় সব উকিল-ব্যারিষ্টার ডাক্তার, প্রফেসার রয়েছেন এখানে—আমাদেরই পাড়ার ছেলে সাইকেল রেসে ফার্ষ্ট হয়েছে। (দ্বিগুণ হাততালি) আমরা সেই মহান উত্তরাধিকারকে তুলে ধরব। এখন চাই শুধু সহযোগিতা। দলে দলে এগিয়ে আসুন আপনারা, সাহায্য করুন। আমরা দেখিয়ে দেব, বাঙালী ইচ্ছে করলে কী না পারে। জয় আমাদের হবেই হবে।' (দীর্ঘস্থায়ী করতালি)।

অলোক তার বক্তৃতা শেষ করার পর ক্লাবের ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে সাধুবাদ জানাতে লাগল। প্রায় একটা হীরো ব'নে গেল সে।

'বেশ বলেছেন অলোকদা।'

'মার্ভেলাস! প্রেসের কোনো রিপোর্টার আসেনি?'

'না আসুক, আমরাই একটা রিপোর্ট তৈরী করে কাগজে পাঠিয়ে দেব।'

'নাঃ, অলোককেই এবার সেক্রেটারী করতে হবে। তাহলে আর চাঁদার ভাবনা করতে হবে না।'

'চুপ চুপ, কালুদা বলছেন।'

'বাবু মহাশয়রা', কালু একটা ঢোক গিলে বললে, 'কলেরার বিষয়ে আমি কী বলব? আমি কিস্যু জানিনে। আমার কলেরা হয়নি, কলেরায় আমি মারওনি। (সভাস্থলে হাসি) মরিনি, যাকগে সে কথা। আমি কলেরার রুগী দেখিনি। ডাক্তার তো আর নাইরে বাবা, দেখিওনি,—দেখার খুব আহিজ্জোও নেই। (হাস্যধ্বনি) হাসবেন না দাদা ভাইরা, বক্তিমে জানিনে, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, জানেনই তো। তা কথা হল গে—কলেরা'... অলোক দাদা বলল, আমরা বস্তির মানুষ ইঞ্জিশান নিতে ভয় পাই। পাই-ই তো। দরদ হয়, জ্বর হয়। গতর খাটিয়ে খাই তো, কাজ কামাই গেলেই বিভিষণ অবস্থা। (হাস্যধ্বনি) হাসবেন না, বড় কষ্টের কথা। যেদিকে তাকাই সে দিকেই অব্যবস্থা। কেন অব্যবস্থা? তা সে দোষ কর্পোরেশানের। এই তো বচ্ছর বচ্ছর শুনে আসছি। বলি, কর্পোরেশানটা কে হে বাবা? এমন বোম ভোলানাথ তো

জন্মে দেখিনি। আমাদেব ধ'রে ধ'রে না-ফু'ড়ে ওর গায়ে দাদারা একটা ইঞ্জিশান লাগাও .দখি তো! (হাস্যধ্বনি) হাসো ক্যান, বলি হাসিব কথাটা কোথায়? (রাগত স্বরে) কলেরা আমরা তুদিনে সরিয়ে দেব, তোমরা আগে 'কর্পোরেশান' সারাও। এ' হল গে আরও কঠিন ব্যামো। কলেরা আসে কলেরা যায়, বসন্ত আসে বসন্ত যায়, যক্ষ্মা যে যক্ষ্মা তাও কখনো কখনো যায়, কিন্তুক এই অসাধ্য ব্যামো, কর্পোরেশান, এতে ধ্বরো আর কেউ নেই। এইটে আগে সারাও তো দেখি দাদারা তারপর হেঁ-হে-হেঁ, বলো 'খন আবার একটা মিটিং ফেদে—কালু তুই বলিছিলি বটে। নমস্কার বাবুমশায়রা। হে-হে হেঁ।'

কালু হাসল, কিন্তু আমরা কেউ আর সে হাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না।

॥ দুই ॥

আজ আমার বিষয়বস্তু হল, নতুন রীতির ছোট গল্প বা হাল আমলের বাংলা কবিতা। পাঠক! শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন।

প্রথমেই অবশ্য আপত্তি উঠবে, গল্প আর কবিতাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলার কারণ কী? মাফ করবেন, আমি গোলাইনি। বরং ঐ তুটির-শিল্পরীতিই আমাকে গুলিয়ে তুলেছে। একটা লেখা পড়তে বসে সেটা কবিতা না গল্প তা ঠিক ঠাহর করতে পারিনে। কবিতা

বলে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত দেখেছি সেটি একটি গল্প, এবং গল্প ভেবে পড়তে শুরু করে অচিরাৎ হৃদয়ঙ্গম করেছি, তার ধরনধাবণ মোটামুটি প্রায় কবিতার মতো। আবার একই রচনার মধ্যে কিছুটা গল্প আর কিছুটা কবিতা, এও একেবারে দুর্লভ নয়। এবং সবচেয়ে যা মজার ব্যাপার, দু'রাজ্যের বর্ডার লাইনটা ঠিক কোথায় তাও যেন হদিস করা যায় না।

আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কবি আছেন, নতুন রীতির গল্প-লেখকও আছেন। তাঁদের কাছে আমি আমার অসুবিধের কথা নিবেদন করেছি। তাঁরা ছাড়া-ছাড়াভাবে যে দু'একটা জবাব আমাকে দিয়েছেন, তা থেকে আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব যে কিছু একটা বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারব না।

কবিতার কথা আগে বলি। কবিরা বলেন, কবিতার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ চিরকালই ছিল। যেমন গীতি-কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, কাহিনী-কবিতা ইত্যাদি। এই ভাগগুলো এখন সব সময় ইঞ্চি মেপে মানা হয় না। সেইজন্যেই কখনো কখনো কবিতার মধ্যে গল্পের আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসল অসুবিধে ঘটে অন্য ব্যাপারে। একটি সমকালীন কবিতা তার পাঠকদের কাছে থেকে যে পরিমাণ একাগ্রতা দাবি করে বেশির ভাগ পাঠকই তাতে সাড়া দিতে পারেন না। তাছাড়া তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাও তার পরিপন্থী। পাঠ্যজীবনে তাঁদের মনে এমন কোন সংস্কারই দানা বাঁধতে পারে না যাতে তাঁরা আধুনিক কবিতার রস গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্যে কেবল রবীন্দ্রোত্তর কবিতার পঠনপাঠনই নয়, বর্তমান জগতের বহুবিচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও জটিলতার

বিষয়েও মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। বলা বাহুল্য এমন পাঠক লাখে মেলে এক।

কিন্তু আমরা পাঠকরাও এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারি। প্রথম কথা, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের অনেককেই আমরা ভালো করেই চিনি। তাঁদের অধীত বিদ্যা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ইত্যাদি এমন নয় যে আমরা বিশ্বাস করতে পারি 'বর্তমান জগতের বহু বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও জটিলতার বিষয়ে' তাঁরা নিজেরাই খুব একটা খোঁজখবর রাখেন। কাজেই, এ থেকে দ্বিতীয় বক্তব্য এই ওঠে যে, হয় তাঁরা স্বয়ম্ভু জীনিয়াস, নয়তো বুজরুক। কিংবা এ দুটো দলে যদি তাঁদের ফেলা নাও যায় তো নকলনবীশ তাঁরা অবশ্যই। অর্থাৎ, হাল-আমলে-আমদানী-হওয়া পঞ্চাশ বছর আগেকার ইউ-রোপীয় আধুনিকতার কার্বন কপি। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য একটা আছে বইকি। আসলে আর নকলে তফাৎ কিছু থাকবেই। তাছাড়া ভাষা-ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাও তুচ্ছ করার মতো নয়। ফলে খুঁড়িয়ে চলার ছাপটা এর সর্বত্র। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ইত্যাদি থেকে শুরু করে কমা সেমিকোলনের প্রয়োগে পর্যন্ত অপটুতা প্রায় একচ্ছত্র। তাই বাংলা কবিতাকে মনে হয় যেন হিব্রু পড়ছি।

তাছাড়া ভাবের দীনতা আবেগের তুচ্ছতা কিংবা পৌনঃপুনিক কনসীটের ব্যবহার, এসব তো প্রায় এপিডেমিকের মতো ক্রমবিস্তার-প্রয়াসী। দৃশ্য, জল, নায়ক, ঈশ্বর, রক্ত, যন্ত্রণা, বাগান ইত্যাদির সংযোগে এমন কতকগুলো 'ক্লিশে' তৈরি হয়েছে আজকাল যা দেখলেই গা-কেমন ক'রে ওঠে।

মোটকথা, একালের কবিতা বোবার সঙ্গীতের মতোই অর্থহীন

এবং করুণ।

জানিনে এর উত্তরে কবিরা কী বলবেন।

এই অবসরে আমরা গল্পের প্রসঙ্গে আসি। দেখা যাক, গল্প-লেখকেরা আমাদের কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা।

না, পারেন না। বলা বাহুল্য, আমি নতুন রীতির গল্প-লেখকের কথাই বলছি। এই তরুণ লেখকেরা যেন আমাদের প্রাগ্ কবিদের চেয়েও অকরুণ। কারণ কবিরা যা লেখেন তা বলে-কয়েই লেখেন। কিন্তু এঁরা, এই নতুন গল্প-লেখকেরা ঁ কি দিয়ে শতকিয়া শেখানোর মতো গল্পের নাম ক'রে কবিতা পড়ান, আর সেটা হয় আরো মারাত্মক। বলা যায়, এটা এক রকম প্রবঞ্চনাও। দুঃখের বিষয়, পাঠকের প্রতি এই প্রবঞ্চনায় শেষ পর্যন্ত প্রবঞ্চিত হন কিন্তু গল্প-লেখকেরা নিজেরাই।

অবশ্য এজাতের গল্পে নামকরণের মধ্যেই একটা নিষেধের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন ধরুন —'অপর্ণার মন, ভাঙা কাচ আর শঙ্খচিল' কিংবা 'অমাবস্যার ভ্রমর আর আকাশের দরজা' অথবা মৃত্যুর পাপাড়িতে। কিন্তু হাজার হোক, গল্প তো তাই নামের বাধাটা পাশ কাটিয়ে রচনার ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। আর সেখানেই শুরু হয় বিপত্তি। গল্পগুলোর কয়েকটা মুদ্রাদোষ অবশ্য গোড়াতেই মেনে নিতে বাধ্য হই আমরা। যেমন সিনট্যাক্সের অভাব যুক্তির অসংলগ্নতা, উপমা দিয়ে কথা বলার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সব থেকে বিমূঢ় করে, গল্পের নামে লেখকের 'আত্মজৈবানিক নিম' (সুধীন্দ্র দত্ত থেকে উদ্ধৃত) খাওয়ানো। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো গল্পই থাকে না এসব গল্পে। কিংবা যা থাকে তা অত্যন্তই মামুলী।

যেমন, একটি ছোট ছেলে ( ডাকঘর নাটক থেকে আমদানী করা ? ), দিদি বা ঐ বয়সের কোনো মেয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দুপুরের নিঃসঙ্গতা, উঠোনের চড়ুই আর একফালি আকাশের হাতছানি, কিংবা সবক্ষণ দাগী আসামীর মতো ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক, এইসব। গল্পটা চলে ডুবসাঁতার দিয়ে মাঝে মাঝে শুশুকের মতো ভেসে উঠে শ্বাস ছাড়ে—সেইটুকুই যা জীবনের চিহ্ন। নয়তো মনে হতো, অনন্তকাল ধরে কে যেন কানের কাছে একঘেয়ে সুরে নামতা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে আর কতোটুকু শাস্তি! জামাই-ঠকানো ছড়া শোনার মতো অপ্রস্তুত ভাবটা তবু থেকেই যায়।

তাছাড়া, এজাতের গল্পে আরো একটা প্রধান গুণ (!) হল এর ঋজুভাষণ। যেখানে আপনি জানতে চান সেখানে লেখকেরা মৌন থাকলেও যেটা আপনি জ্ঞাতব্য মনে করেন না, তা জানাতে এঁদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মানুষের দৈহিক ক্রিয়াগুলোর বর্ণনা এঁরা বেশ নিপুণতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেন; ঘাম, রক্ত, বমি থেকে শুরু করে ঘেয়ো কুকুর, মাছি, মলমূত্র ইত্যাদি সমস্তই এঁদের কৃপায় সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে এঁদের আপনি একচোখো মনে করবেন না। এঁরা কুৎসিতের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের বিষয়েও সচেতন। দুটোকে এঁরা একসঙ্গে 'পাঞ্চ' করে দেন—যাতে হরিষে-বিষাদের মতো একটা মিশ্র অনুভূতি আপনাকে ব্যাকুল করে তোলে। একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, ( কিন্তু সবটাই মনগড়া নয়। ) যেমন ধরুন—

হাবুল বেওয়ারিশ কুকুরের মতো রাস্তায় ভাসল। ধুলো। ড্রেন। দোকানীটা আচ্ছা পাজি, চিল্লাচ্ছে কেমন ষাঁড়ের মতো।

ঝাঁড় অবশ্য খুব কম চিল্লোয়। বড়দার মতো বাশভারী। বড়দা কি টের পেয়েছে তার পকেট থেকে পয়সা মেরেছি? দোকানীটা ধার দিল না, কী করব! হাবুল দাঁড়াল। ড্রেনের পাশে বসে '—' করল। (লেখক কিন্তু আসল কথাটাই লিখবেন ঐ কোটেশান মার্কা জায়গায়।—জৈমিনি।) তারপর হাই তুলে একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নাক খুঁটতে লাগল। সিঁকনি। সামনের আকাশটায় রোদ্দুরে ডানা মেলে দিয়েছে কয়েকটা শঙ্খচিল। নীঃ। কী নীল! হাবুল ওখানে কোনদিনও যাবে না। কোনদিনও পাবে না শঙ্খচিলের বুকের ইচ্ছে।..

এরপর যদি আপনার মনে হয়, গল্পলেখক রাঁচির একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বাসিন্দা এবং কলকাতায় তাঁর থাকাটা মোটামুটি একটা স্থান-বিভ্রাট মাত্র, তাহলে দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু ঘটনা যদি এই হয় যে, লেখকরাই মনে করছেন তাঁরা যথাস্থানে আছেন, অর্থাৎ এই কলকাতা শহরটাই আসলে রাঁচির ঐ বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির দোসর, তাহলে অবশ্য বিলক্ষণ দুশ্চিন্তার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

পরশুরামের অনুকরণে আমরা 'আল্লা কালী যীশুর' নামে দিব্যি দিয়ে বলছি, এমন মিটামিটে পাগল-অধ্যুষিত কলকাতায় থাকার চেয়ে আমরা বরং ডানাপিটে পাগলের আশ্রয় কোনো উন্মাদনিকেতনে থাকাও বেশি শ্রেয় জ্ঞান করি।

নতুন রীতির গল্প-লেখকেরা কী বলেন?

## ॥ সাত ॥

কবি-সম্মেলন কাকে বলে জানেন কি আপনারা নিশ্চয়ই? জানেন। আজকাল খবরের কাগজের মারফত কতো রকমের সংবাদই ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যে কবি-সম্মেলনের বিবরণও হয়তো আপনাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু মাছের গল্প আর মাছ-খাওয়ার আস্বাদ যেমন দু জাতের জিনিস, তেমনি কবি-সম্মেলনের খবর শোনা আর উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা দু ধরণের অভিজ্ঞতা।

আমার এক কবিবন্ধু আছেন। তাঁর সঙ্গে আমি কবি-সম্মেলনে উপস্থিত থেকেছি মাঝে মাঝে। ঈশ্বর মানুষকে দুটি চোখ আর দুটি কান দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বেলায় দিয়েছেন তিনটি করে। আমার সেই অদৃশ্য চোখ আর অশ্রুত কানে কী আমি দেখেছি-শুনেছি, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছি এখানে। যারা এ ধরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেননি তাঁরা কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন।

প্রথমেই বলে রাখি, কবি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি তা আমি জানিনে। আজকাল আধুনিক কবিতারই একচ্ছত্র আধিপত্য। কবিরা নিশ্চয়ই এমন আশা করেন না যে, শোনা মাত্রই এ জাতের কবিতা পাঠকের মন কেড়ে নেবে! এ কবিতা পাঠ্য যদি হয় তো সে মনে-মনে এবং একা একা আবৃত্তিযোগ্য হলেও তা ঘরোয়া আসরে।

মঞ্চ-মাইক-সভার ভিড়ে এর সমস্ত ব্যঞ্জনাই প্রায় হাওয়ায় উড়ে যায়, মনে এসে দানা বাঁধে না।

কবিরা তাহলে কবিতা পড়তে যান কেন?

যান, নামের লোভে। আর যারা ঈষৎ খ্যাতিসম্পন্ন তাঁরা যান দুর্নামের ভয়ে এবং আরো নামের লোভে। কবিতা লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, কবির নামটা তারা শুনুক, কবিকে দেখুক। এতেই তাঁদের আনন্দ।

আর শ্রোতারা? তাদের মধ্যে কবিতা-রসিক কেউই থাকেন না একথা আমি বলব না। কিন্তু তারা সংখ্যালঘু। বৃহত্তম জনসংখ্যার মহত্তম উদ্দেশ্যই হল মজা-দেখা। এবং সেইসঙ্গে ছাপার অক্ষরে যাঁদের নাম দেখা যায় মাঝে মাঝে তাদের স্বচক্ষে দেখে নয়ন-সার্থক করা। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বলতে বিশেষ কেউ থাকেন না। কিংবা থাকেনও যদি, তাদের বয়স, শ্রেণী ইত্যাদি লক্ষ্য করে মঞ্চের উপর আসীন কবিদের হৃদয়-মন যে খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না তা বলাই বাহুল্য।

বেশি নয়, আমার দু দিনের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছি আপনাদের।

একটি কবি-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের আপিসে বসে আছি। সভামঞ্চ সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, একজন শিল্পী তখন পল্লীসঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তাও শোনা যাচ্ছে। অগণিত শ্রোতা, সভাস্থল কালো মাথায় একাকার হয়ে গেছে। বেশ লাগছে দেখতে।

তারপর গান শেষ হল। মাইকে ঘোষণা করা হল, 'এবার শুরু হবে কবি-সম্মেলন।'

কী আশ্চর্য, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমার মনে হল—কথা নয়, মাইক থেকে যেন স্প্রে করা হল ফ্লিট, আর সভাস্থ অগণিত জনতা তার তোড়ে ডানামেলা মশার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পালিয়ে যেতে লাগল এদিকে ওদিকে!

হাস্যকর, কিন্তু মর্মান্তিক দৃশ্য।

অথচ লোকে বলে বাংলাদেশ নাকি কবিতার দেশ। হায় বাংলা, হায় রে কবিতা!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বেশ কিছুদিন আগের ব্যাপার, অর্থাৎ কবিতাকে একটা আন্দোলনের আকারে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এই ধরণের প্রয়াসের একটা কাহিনি সম্বন্ধে ঘটনা। উদ্যোক্তারা বেশ উৎসাহী মানুষ। খবরের কাগজে আগে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, প্রাচীরপত্র লাগিয়েছিলেন, এবং ৩৩০ যথেষ্ট হবে না বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের দিন সভাস্থলের গেটে নহবত বসিয়ে বিয়েবাড়ির মতো সানাই বাজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে যা ঘটল তা ভয়াবহ। সভাস্থলে লোকজন অনেক, কিন্তু দেখা গেল শ্রোতাদের প্রায় বেশির ভাগ মানুষই কবিতা পড়তে আগ্রহী। ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। প্রায় সত্তর-আশি মানুষ, সকলেই কবি, সকলেই কবিতাপাঠের দাবিদার! উদ্যোক্তারা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শেষে সিদ্ধান্ত হল, একটা নীতি স্থির করা যাক—যাঁদের কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি, তাঁদের কবিতা পড়তে দেওয়া হবে না। ওঁরা বোধহয় ভেবেছিলেন এইভাবে হয়তো কবিতাপাঠকারীর সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে। কিন্তু মিথ্যাই সে

দুরাশা। ইস্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার তো শেষ নেই। এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে উঠে গেছে এমন পত্রিকার কথা তো প্রত্যেক পাড়াতেই শোনা যাবে একাধিক। তার উপর আছে মফঃস্বলের কাগজ। ফলে অনেক চেষ্টা করেও আবেদনকারীর সংখ্যা শ' দুয়েকের কমে নামানো গেল না কিছুতেই।

অতএব বসল একটা নির্বাচনী কমিটি। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক তাঁর দুজন সহকারীকে নিয়ে এক অসাধারণ কাজে ব্রতী হলেন। আবেদনকারীদের তালিকা নিয়ে একজন সহকারী নাম পড়ে যেতে লাগলেন, আর সম্পাদক তাঁর রায় দিয়ে যেতে লাগলেন। যেমন—

সহকারী। মন্মথ শিকদার—

সম্পাদক। কবি।

সহকারী। সুরেশ চৌধুরী—

সম্পাদক। কবি নয়।

তারপর ব্যাপারটা এগোল বেশ তড়িৎগতিতে। একটি করে নাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য—'কবি', কিংবা 'কবি নয়।' মিনিট পনের পরে সহকারীর মুখে গাঁজলা উঠল, সম্পাদক চোখ বুজে কপাল টিপে ধরলেন। কিন্তু তবু চলতে লাগল কবি নির্বাচনের কাজ।

হয়তো এভাবে নির্বাচন এক সময়ে শেষ হতো। হয়তো লটারীতে নাম-ওঠা কবিরা হৃষ্টচিত্তে কবিতাপাঠ করে অক্ষয় আনন্দলাভ করতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

একজন ষণ্ডাগোছের লোক এগিয়ে এসে সাধারণ সম্পাদকের জামার কলার চেপে ধরল, এবং সেই সঙ্গে এল তার হুকুম—

'মেরে পোস্ত বানিয়ে দেব। সুকুর নাম কাটা চলবে না।'

সুকু অর্থাৎ সুকুমার খাসনবীশ তাদের ক্লাবের ছেলে। ছোটবেলা থেকে সে 'পদ্য লেখে' : সে আলবৎ কবি। আর সে যদি কবি না হয়, তাহলে কোনো শা—ই কবি নয়। ওসব বুজরুকি চলবে না।

পেছন থেকে শোনা গেল জয়োল্লাস। যাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল তারাই সংখ্যাগুরু। অতএব—

অতএব আর কি? কবি সম্মেলন স্থগিত রাখা হল। যে যার বইপত্র গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। কবিদের মুখর উৎসাহে মাইকযন্ত্রটি সেদিন নীরব হয়েই রইল।

এমন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি! একটি বাংলা প্রবন্ধে একদা পড়েছিলাম— 'কবিতা স্বভাবতই মানুষের হৃদয়হারিণী।' এখন যদি কেউ ও ধরনের প্রবন্ধ লেখেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি লিখবেন—'কবিতা স্বভাবতই মানুষের প্রাণহারিণী!'

## ॥ আর্ট ॥

ছেলেবেলায় একটা কথা পাঠ্য বইয়ে পড়েছিলাম, আজও তার প্রভাব মন থেকে মুছে যায়নি। কথাটা ছিল বোধহয় আচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কোনো রচনায়। যতোদূর মনে পড়ে বাক্যটা ছিল এইরকম—

মহামতি গোখলে একদিন বাঙালীর ললাটে গৌরবটিকা দিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙালী আজ যাহা ভাবে, ভারতবাসী তাহা কাল ভাবিবে।

সে বয়সে অবশ্য 'মহামতি গোখলে' কে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তিনি যে অবাঙালী তা বুঝেছিলাম। এবং এটাও বুঝেছিলাম যে, অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাগ্রহে স্বীকার করে-ছিলেন, তামাম ভারতবর্ষে বাঙালীর স্থান সবাগ্রে।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে শিখেছি, ওসব সোনার দিন এখন রূপকথা। বাঙালী জাতি হৃতশক্তি, হৃতগৌরব। সারা ভারতে তার স্থান পিছনের সারিতে।

এই নিয়ে আমাদের মনে দুঃখ আছে, ক্ষোভও আছে। ক্ষোভটা এই কারণে যে, আমরা মনে করি বাঙালীরা আজ অবহেলিত, বাঙালীর সদ্‌গুণ কারো চোখে পড়ে না। বরং কী করে বাঙালীকে সবদিক থেকে হটিয়ে রাখা যায় তারই চক্রান্ত যেন আকাশে-বাতাসে ফণা উঁচিয়ে ঘুরছে। এ হেন অবস্থায় হঠাৎ একটা খবর শুনে চমকে উঠতে হল।

খবরটা বলার আগে একটা গল্প শুনিয়ে নিই।

এক রাজার সাত ছেলে ছিল। তারা সকলেই অকর্মা, রাজ্য-শাসনে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। যুদ্ধবিগ্রহ তারা তো পছন্দ করতই না, তার উপর তাদের স্বভাবও ছিল ভালোমানুষ ধরণের।

এইসব দেখে রাজার বড় দুশ্চিন্তা হল। এমন সব অপদার্থের

হাতে রাজ্য এলে তারা তো দুদিনেই সব উড়িয়ে দেবে। অথচ সাত-সাতটা ছেলে থাকতে বাইরের লোককেও তো রাজ্য দিয়ে যাওয়া যায় না। তখন তিনি তাঁর মনের দুঃখ মন্ত্রীর কাছে খুলে বললেন। মন্ত্রী জানালেন, রাজত্ব তো ছেলেদেরই কারো হাতে দিয়ে যেতে হবে, এ আর নতুন কি? তবে যাকে দেওয়া হবে বুদ্ধিতে যেন সে পাকা হয়—তাহলেই সব দিক নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু কে বেশি বুদ্ধিমান তা জানা যাবে কী করে?

জানা যাবে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে: মন্ত্রী বললেন, ছেলেদের নিয়ে একটা নতুন ধরণের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা হল এই যে—এরপর কানে কানে কী সব মন্ত্রণা দিলেন তিনি রাজাকে।

নির্দিষ্ট দিনে সাত রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে রাজার কাছে হাজির হল। রাজা বললেন, 'আমার রাজ্য সেই পাবে, যে নতুন ধরণের ঘোড়দৌড়ে প্রথম হবে। তোমরা ঘোড়দৌড় মাঠের মাঝবরাবর গিয়ে একটা খড়িব দাগ দেওয়া লাইন দেখতে পাবে। সেই লাইনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'ওয়ান-টু-থ্রি' বলার পর তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘোড়া ছোটাতে শুরু করবে।......রাজ্য পাবে সেই, যে থাকবে সবার শেষে

রাজার হুকুম, কাজেই ছেলেদের তা মানতে হল। খড়ির লাইনে সাত রাজপুত্র ঘোড়া নিয়ে দাঁড়ানোর পর সেনাপতি বললেন—'ওয়ান-টু-থ্রি।' আর ওমনি নগরপাল হাতে তালি দিয়ে দিয়ে তিরিশ সেকেণ্ড গোনার জন্যে হাঁকতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার .....।

রাজপুত্রেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। প্রত্যেকেই ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে পাশে চেয়ে দেখল পাশের ভ্রাতাটি একটু দেরি করে ঘোড়া ছোটাবার ফিকিরে আছে। ফলে প্রথমোক্ত রাজপুত্রও তার লাগামে ঢিলে দিল। আর এইভাবে সকলেই দাঁড়িয়ে রইল যে যার জায়গায়।

কিন্তু ওদিকে নগরপাল হেঁকে যাচ্ছে—ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ… ..

হঠাৎ ছোট রাজপুত্রের মাথায় একটা ব্রেন-ওয়েভ এল। সে ত্বরিৎগতিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করল।

অন্য রাজপুত্রেরা দু'মিনিট থমকে দাঁড়াল। তারপর একে একে তাদেরও মাথায় এল ব্যাপারটা। তারা বুঝল, এই তো ফোডডেড! খড়ির লাইন থেকে ঘোড়া ছোটাতে হবে, আর যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকবে সেই পাবে রাজ্য। ঐ তো ছোট রাজপুত্র পিছিয়ে যাচ্ছে! তখন সবাই ছুটল তাকে পিছনে ফেলতে। কিন্তু বড়ই বাহুল্য, তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। উল্টো দিকের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হল ছোট রাজপুত্রই।

এখন, আগে যা বলছিলাম সেই খবরটার কথা বলি।

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কলেরা রোগে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে বাংলা দেশ, আর বাংলা দেশের মধ্যে হাওড়া-কলকাতা, এবং হাওড়া-কলকাতার মধ্যে হাওড়া।

শুনে বড় আনন্দ হল। কে বলে বাংলাদেশ সব ব্যাপারেই পিছিয়ে আছে? এই তো দিব্যি আমরা এর নতুন প্রতিযোগিতায়

প্রথম হিসাবে নাম কিনলাম! ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটা কি ছোটা নয়? আমরা ছুটছি। 'কলিকাতা কর্পোরেশনে'র নামে 'কলেরার টীকা নিন' বলে যতোই সাইনবোর্ড টাঙানো হোক না কেন শহরে, যতোদিন আমাদের ফুটো জলের পাইপ আছে, ততোদিন কাউকেই পরোয়া করিনে আমরা। প্রথম আমরা হবই।

আর এরপরও যদি কেউ আমাদের এ সুনামে বাদ-সাধেন, যদি শহরের উন্নতি করবার জন্যে পরামর্শদাতা ডেকে আনেন, তাহলে— তাহলে সত্যি বলছি, ভয়ংকর প্রতিশোধ নেব আমরা। পরামর্শ-দাতাটিকে একবার বেড়াতে নিয়ে যাব এসপ্লানেডে, আর ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাইয়ে দেব এক ফালি কাটা-তরমুজ। ব্যস্, আর ভাবতে হবে না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সব সাফ্।

তখন নতুন করে কোনো অর্বাচীন 'মহামতিকে' বলতে হবে— বাঙালী আজ যাহা ভাবে, কোনো মানুষই তাহা কোনোকালে ভাবিতে পারিবে না।

## ॥ নয় ॥

ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? আমরা যখন শহরের আবর্জনা, বস্তি, জলাভাব, কলেরা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অন্যমনস্ক, ঠিক সেই সময় আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে মাঝেমাঝে।

অবশ্য আশ্চর্য বলা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, আমি শুনেছি, কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে বার-বার বিস্ময় প্রকাশ করা ন্যাকামির পর্যায়ে পড়ে। যে ব্যাপারটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা নতুন নয়। গত বছরও ঠিক এমনি সময়, প্রায় এইভাবেই শুরু হয়েছিল ঘটনাটি। আর তখন সোরগোলও আমরা করেছিলাম যথেষ্টই। কাজেই এ বছরে তার পুনরাবৃত্তিতে অবাক হওয়া যাবে না। বিস্মিত হব বরং এই ব্যাপারটা দেখে যে, আমরা কতো সহজে একটা পুরনো অভিজ্ঞতাকে ভুলে যেতে পারি।

ভুলেই গিয়েছিলাম বটে! নাহলে এর জন্যে প্রস্তুত থাকতাম, বেকায়দায়-পড়া প্রাণীর মতো ছটফট করতাম না।

আমি বলছিলাম বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা! মাঝেমাঝে সে ব্যবস্থায় যে আজকাল ছেদ পড়ছে, এ তো প্রায় পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু গত বছরের চেয়ে এ বছরে তার জন্যে আমরা বেশি প্রস্তুত থাকতে পারিনি। আমি বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি, কলকাতায় এ বছরে মোমবাতি বা হাতপাখার দোকান বেশি করে খোলা হয়নি। অথচ পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। কেন-যে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি আমরা সেইটেই আশ্চর্যের।

সত্যি ভেবে দেখুন, ব্যবসার কথা ছেড়ে দিলেও, রুচির দিক দিয়েও কি সেটা কম নতুনত্বের হত? বাংলা উপন্যাসে যেভাবে একদা নায়ককে খেতে বসিয়ে নায়িকাকে দিয়ে হাতপাখার হাওয়া করানো হত, নিছক আর্টিষ্টিক কম্পোজিশন হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। সেই খাঁটি বাংলার দেশজ প্রথাটিকে অনায়াসেই ফিরিয়ে আনতে পারতাম আমরা। তাছাড়া সেজবাতির প্রচলন করে হয়তো

আমাদের চক্ষুরত্নগুলিকেও বাঁচাতে পারতাম চশমার আক্রমণ থেকে। এ সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করলাম।

জানিনে, কী আশায় হাত গুটিয়ে বসেছিলাম এতদিন। আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম যে যন্ত্রগত যে কারণে গত বছর বিদ্যুৎ সরবরাহে অকুলান ঘটেছিল, এ বছর তার সংশোধন হবে? কিন্তু অন্য দশটা ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি এই ধরণের বিশ্বাস জন্মানোর সপক্ষে? আমাদের স্মরণকাল পর্যন্ত বরং এইটেই কি আমরা বছরে বছরে দেখে আসিনি যে, এ দুর্ভাগ্য শহরে যা একবার যায়, তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না? তবে?

অবশ্য এ সব প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না, তা আমি জানি। এসব হল প্রায় আত্মজিজ্ঞাসার মত দার্শনিক ব্যাপার। উত্তর পেয়ে গেলে প্রশ্নটাই বড় অকিঞ্চিৎকর শোনায়। কাজেই এসব কথা ছেড়ে বাস্তবে যে অবস্থা আছে সেইদিকেই বরং মনোযোগ নিবদ্ধ করা যাক এবার।

বাস্তব পরিস্থিতি হল—বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা। এই আকস্মিকতার মধ্যে মজা আছে, আবার দুঃখও আছে। অনেকটা ঠিক নাটকের মতো। ট্র্যাজেডির আশেপাশে কমিক রিলিফের ব্যবস্থা। দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে ব্যাপারটা কম উপভোগ্য মনে হওয়ার কথা নয়।

ধরা যাক রামবাবু নামে এক ভদ্রলোকের কথা। ভীষণ রাশ-ভারী মানুষ, বাড়ির লোক ভয়ে তটস্থ। কিন্তু তাঁর যে এমন ভূতের ভয় আছে তা কেউ জানত না। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলেন প্রথম জীবনেই। কিন্তু তাঁর কাছেও

রামবাবু আসল কারণটা এড়িয়ে গিয়ে বলে এসেছেন ভয়টা আসলে চোরের বিষয়ে।

তা সে যাই হোক, এই রামবাবু সেদিন কলকাতার বাইরে একটা অফিসিয়াল টুর সেরে এসে স্নান করতে গেছেন। রাত তখন প্রায় নটা হঠাৎ সমস্ত বাড়ি নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল। রামবাবু আমার-আপনার মতোই 'আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি'র অন্যতম সংস্করণ। তিনি মাথায়-জলঢালা অস্পষ্ট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই, আলো নেভালো কে?'

স্ত্রী বাইরে থেকে জানালেন, 'সারা বাড়িতেই গেছে।

'তাহলে ফিউজ হ'য়েছে। বঙ্কা কোথায়? কী আশ্চর্য। আঃ!'

স্ত্রীর উক্তি, 'সমস্ত পাড়াটাই অন্ধকার। কারেন্ট বন্ধ হ'য়ে গেছে।'

'কী মুস্কিল! আঃ।'

'আঃ আঃ করছ কেন? স্নান সেরে বেরিয়ে এস।

'না না, একটা আলো দাও—মোমবাতি! এভাবে এখানে থাকা যায় না।'

'কেন, ওখানেও চোর ঢুক'বে নাকি?' সুযোগ পেয়ে নারীকণ্ঠে পরিহাসের বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'আর ভরসন্ধ্যাবেলায় ভূতই বা আসবে—।'

তাঁর কথা শেষ হ'তে পেল না। দড়াম ক'রে দরজা খুলে সজলগাত্রে ছুটে বেরিয়ে এলেন রামবাবু, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—'আরে ধ্যাৎ। যত্তো সব ইয়ে। যাও, তোয়ালেটা নিয়ে এস ভেতর

থেকে।'

'ভেতর' মানে অবশ্য বাথরুমের ভেতর—যেখানে থেকে বক্তা এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন, এবং দ্বিতীয়বার প্রবেশ করতে নারাজ!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ঘটনাস্থল একটি রোগীর শয়নকক্ষ। অসুখ গুরুতর, হার্টের অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার এসেছেন, নাড়ি দেখে একটা জরুরী ইনজেকশান দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। রোগীর হাতের উপর অ্যালকোহল-তুলো ঘষে যেই ছুঁচটি প্রায় কাছাকাছি এনেছেন, অমনি সেই আসন্ন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার। তারপর –

'টর্চ আছে?'

'না তো।

'মোমবাতি?

'ছিল তো। কাল বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে।'

'কী আশ্চর্য, নিন, একটা দেশলাই জ্বালুন।'

জ্বালা হল। সাতটি দেশলাই কাঠিতে ইনজেকশান দেওয়া হল, দশটিতে শেষ হল সিরিঞ্জ পরিষ্কার করে ব্যাগ গুছিয়ে ওঠা, তারপর বিনা আলোয় ভিজিট গ্রহণ এবং পাঁচটি কাঠি জ্বেলে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রমণ।

এ রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার দরকার নেই। এক কথায় বলা চলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া মানে কালপ্রবাহ বন্ধ হওয়া।

কিন্তু এত কথা না বললেও বোধ হয় চলত। কারণ, বলেছি,

আগেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। আমি তাই একটা প্রস্তাব করতে চাই সবিনয়ে—

একদা মহাভারতের যুগে বক নামক এক রাক্ষস যেমন একচক্রা গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি সদয় হ'য়ে ব্যবস্থা করেছিল, প্রত্যেক দিন এক-একটি পরিবার থেকে একটি ক'রে মানুষকে তার আহার্য হিসাবে পাঠাতে হবে, তেমনি বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান দস্তুরমতো নোটিশ দিয়ে এক-একটি পাড়ায় পর্যায়ক্রমে তাঁদের সরবরাহ বন্ধ রাখুন। আমরা পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হ'য়ে সেই অখণ্ডনীয় নিয়তির হাতে আত্ম-সমর্পণ করব এবং পর্যায়ক্রমে মোমবাতি এবং হাতপাখার দোকান খুলে যাব।

মন্দ হবে না তাহ'লে!

## ॥ দশ ॥

একটি প্রতিষ্ঠান আছে এই শহরেরই পূর্বাঞ্চলে, তার নাম লুম্বিনী হাসপাতাল। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয় সেখানে। শোনা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি নাকি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'য়েছে। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি আমি এ সংবাদে।

কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করার আগে পাগল, আধা-পাগল এবং হবু-পাগলদের আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছি সরকারী যে

আইনের প্যাচে পড়ে লুম্বিনী হাসপাতালের দুর্দশা ঘটেছে, অচিরেই হয়তো তার সংশোধন ঘটবে এবং প্রতিষ্ঠানটি যেমন আছে তেমনি টিঁকে যাবে। যাঁরা আরো বেশি নিশ্চয়তা দাবী করেন তাঁরা খবরের কাগজের পাতার দিকে নজর রাখতে পারেন।

একটা ব্যাপার ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে, পাগলের বিষয়ে আমাদের এত কৌতূহল কেন। আমাদের বলতে আমি শুধু বয়স্ক-দেরই বোঝাচ্ছি নে, শিশুরাও পড়ে সেই দলে। এবং সত্যি বলতে কি, শিশুদের কৌতূহল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়!

কারণটা অনেক সময়েই হয়তো মজা দেখা। কিন্তু পাগলকে বিরক্ত করে মজা লাগে কেই বা কেন কি?

আমার মনে হয় পাগলায় পরিণত মানুষের সব কিছু দৈহিক লক্ষণই অটুট আছে অথচ আচার আচরণের মধ্যে কোনো যুক্তি-শৃঙ্খলা নেই পাগলদের মধ্যে এই ঘাটতিটাই বালক-বালিকাদের কাছে আশ্চর্য লাগে এবং হয়তো তারা এই ভেবে কিছুটা আত্মপ্রসাদও লাভ করে যে, অতো বড় একজন সাবালক মানুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও বেশি। কিংবা, এসব কিছুই নয় ছোটদের আমোদ লাগে স্রেফ আছাড়খাওয়া দেখলে যেমন হাসি পায় সেই-রকম। জীবনের পথে চলতে চলতে পাগল মানুষটি যে পিছলে পড়ল, সেই পতনটাই হল মজার ব্যাপার।

কিন্তু বয়স্ক মানুষদের কাছে তা নয়। তাঁরাও মাঝে মাঝে খুশি হন পাগল দেখলে, কারণ তাঁদেরও মনের মধ্যে শিশু বাস করে। তবে বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের মনে জাগে করুণা এবং

তারই সঙ্গে মিশে থাকে একটা আতঙ্ক। না, পাগল এসে তাঁদের আক্রমণ করবে সে আশঙ্কা নয়, বরং সময়ের ধাক্কায় নিজেরাই পাছে তাঁরা পিছলে চলে যান পাগলের দলে, সেই আতঙ্ক।

বাস্তবিক, আমরা যারা 'ভারতীয় উন্মাদ আইন ১৯১২'র চাহিদা মতো পাগল হিসাবে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট পাইনি এবং পাইনি বলে কোনো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে রোগী হিসেবে ঢুকতে পারব না, তারাও যে খুব একটা সুস্থ মনে বাস করছি এমন কথা তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বলা যায় না। তাছাড়া অল্পস্বল্প পাগলামি না থাকলে সমাজেও তো তেমন পাত্তা পাওয়া যায় না। ভবঘুরে-প্রকৃতির শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা 'কাজের মানুষ' ব্যাবসায়ী কি চাকুরে যাই হন আপনি, আপনার নিজের পেশার চূড়োয় যদি উঠে থাকেন তো দেখবেন বেশ খানিকটা পাগলামিও আপনার মজ্জাগত হয়ে গেছে। অবশ্য কোনো কোনো মনীষীর জীবনে আপাত-দৃষ্টিতে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, পাগলামিকে ঠেকিয়ে রাখাই তাঁদের পাগলামি। একরকম বলা যায়, তাঁরা হলেন অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক। ঠিক যেমন হয়েছিল বার্নার্ড শ'র দৃষ্টিশক্তির বেলায়। তাঁর চক্ষু-চিকিৎসক বন্ধু ডা ওয়াইল্ড শ'য়ের চোখ দেখে বলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি নর্ম্যাল। তখন শ জানতে চান, চোখে দেখতে পাওয়ার বেলায় নর্ম্যাল কথাটার মানে কি? ডাঃ ওয়াইল্ড এতে স্বীকার করতে বাধ্য হন, বেশির ভাগ মানুষেরই দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক নয়, কিন্তু শ'য়ের চোখ সত্যিই স্বাভাবিক—কাজেই বেশির ভাগ মানুষের তুলনায় তার চোখের দৃষ্টিকে বলা যায়, অ্যাবনর্ম্যালি

নর্ম্যাল!

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের অবস্থাই এর বিপরীত। অর্থাৎ নর্ম্যাল অ্যাবনর্ম্যাল।

এবং এই 'স্বভাবতই অস্বাভাবিক' মানুষের দলেই আমরাও। অবশ্য এসব অস্বাভাবিকতাকে আমরা ঠিক পাগলামি বলে সনাক্ত করিনে, বাতিক বলে একটা ছদ্মনাম বার করেছি, সেই নামে ডাকি। এমন আচার-আচরণ পেলে বাতিক আমাদের অজস্র। খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, চলা ফেরা থেকে শুরু করে মানব জীবনের গোপনতম অনুভূতি পর্যন্ত অনেকের বাতিকের শিকড় ছড়ানো। প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে খুঁটিনাটি খোঁজা কিংবা ভর গ্রীষ্মেও অকারণে নাক মুখ ঢেকে গায়ে সোয়েটার চাপানো, অথবা যে কোনো মিটিংয়ের ডাক এলেই খবরের কাগজে নাম উঠবে মনে করে বাঁটি মেরে বসে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, এগুলো বাতিকের পর্যায়েই পড়ে।

এছাড়া ভূতের ভয় লোকে হাসিমুখেই ব্যক্ত করেন। যাঁরা শোনেন তাঁরাও হাসিমুখে শুনে নেন—যেন এ ব্যাপারে কারোই কিছু করার নেই।

আর চোরের ভয, তা যার নেই তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। বাক্স প্যাটরার কী কথা, ঘরের দেয়ালও তার কাছে বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা বেশির ভাগ মানুষই ঘরের ভিতরে থাকতে ভালোবাসি, এবং বাক্স তোরঙ্গও আমাদের বিলক্ষণ আছে। আর সেগুলির লোভে পাছে চোর এসে ঘরে ঢোকে এ ভয়ও আমাদের যৎপরোনাস্তি।

কিন্তু কারো কারো আবার এই চোরের ভয়টা প্রায় বাতিকের পর্যায়ে চলে যায়। যেমন ধরুন আমাদের ব-বাবুর ব্যাপার। কার্যব্যপদেশে তাঁকে প্রায়ই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়, আশ্রয় তখন ডাক-বাংলো। সঙ্গে জিনিসপত্রও যে খুব বেশি কিছু থাকে এমন নয়। কিন্তু চোরের ভয় তাঁর এমনই মজ্জাগত যে রাতে ঠিক ঘরের মাঝ বরাবর খাট টেনে এনে শোন তিনি, এবং হঠাৎ যদি উঠতে হয় তো পাশে রাখা হারিকেন লণ্ঠনটি আগে খাটের এ পাশে ঝুলিয়ে খাটের তলায় লুক্কায়িত কোনো ব্যক্তির ছায়া খাটের ওপাশের দেয়ালে পড়ে কিনা দেখে নিয়ে তারপর তিনি মাটিতে পা নামান।

আরেকজনকে জানি, রাত্রে শোবার আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ হয়েছে কিনা সেটা টেনেটুনে দেখা ছিল তার পাগলামো। এভাবেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের অনভ্যস্ত দরজায় একটু বেশি জোরে টান দিয়ে হাল কাঠের খিলের ইস্কুপ উপড়ে ফেলেছিলেন। শোনা যায়, তারপর তাঁকে সমস্ত রাতই দরজায় পিঠ লাগিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল।

যাই হোক, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। মানসিক হাসপাতালের দরজা যখন নিঃশর্তভাবে খোলা ছিল, আমরা তখন আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের অল্পস্বল্প পাগলামির মজাটা মুখ বুঁজে উপভোগ করলেও বেকায়দা দেখলে তাদের নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞের হেপাজতে রাখাই নিরাপদ মনে করতাম। কিন্তু এখন ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট ছাড়া পাগল বলে কাউকে ভর্তি করা বেআইনী কাজ হওয়ার ফলে হাসপাতালে রোগী কমলেও গোটা সংসারটাই হয়ে উঠবে বোধ হয় বিরাট একটি পাগলা-গারদ। হায়, শিক্ষা-প্রসারের নামে

সরকারী শিক্ষা-সংকোচনের নীতির মতো এই পাগলাত্মক নীতিও যে অচিরাৎ কী মারাত্মক বুমেরাঙের মতো ফিরে আসবে আমাদের উপর, তা ভেবে শিহরিত হচ্ছি।

## ॥ এগারো ॥

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ ........

এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি কতোবার গাইতে শুনেছি আমরা। কিন্তু এর নিহিতার্থ যে খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করেছি এমন মনে হয় না। গানটি বৃক্ষবন্দনায় রচিত। অথচ, সারা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, বিশেষ করে এই কলকাতা শহরের গাছগুলোর কথা ভাবুন, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে চোখবাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হবে আপনার।

ইডেন গার্ডেন ছন্দভঙ্গ হয়ে গেছে, কার্জন পার্ক হয়েছে দ্বিখণ্ডিত, কিন্তু তাতে দুঃখিত হলেও শোক-প্রকাশ করিনি। ইদানীং কয়েক বছর ধরে পথপার্শ্বের বড় বড় গাছগুলো যেভাবে দাঁতালো করাতের টানে ধরাশায়ী হচ্ছে তাতে বিচলিত না হওয়া অসম্ভব।

আমি জানি, গাছও বুড়ো হয়, তাদের অসুখ করে এবং মারা যায়। কিন্তু একটি রাস্তায় পর পর কয়েকটি গাছ যখন ভবলীলা সংবরণ করে তখন আশঙ্কা হয়, কোথায় যেন একটা অশুভ প্রভাব

সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। হয়তো সেটা এপিডেমিক, কিংবা আর কিছু, আমি জানিনে। কিন্তু দুষ্টলোকে বলে, গাছের এই দলবদ্ধ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাদের হত্যা করা হয়। বলা বাহুল্য প্রথমে আমি এ সব কথায় কান দিইনি। কারণ আমি বুঝতে পারিনি, সংসারে এত রকম কাজ থাকতে হঠাৎ এই গাছ-মারার 'হবি' পেয়ে বসবে কেন মানুষকে? কিন্তু পরে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মরা হাতী লাখ টাকার মতো মরা গাছেরও দাম অনেক। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা তা জানেন এবং জানেন বলেই গাছগুলো মরে গেলে তাঁরা যথেষ্ট অর্থব্যয় করে সেগুলো কেটে নিয়ে গুদামে তোলেন।

এবং তাঁরা গুদাম-জাত করবেন বলেই অনেক ক্ষেত্রে গাছগুলোর মৃত্যু ঘটে। শিকড়ে ঠিক কী দেওয়া হয় এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলেন তুঁতে, কেউ সংশোধন ক'রে বলেন বারবাইড্। যা ই হোক কিছু একটা দেওয়া হয় এবং দেখতে দেখতে কয়েকটি বিশাল সবুজপত্র গাছ ক্ষয়রোগীর মতো শুকিয়ে যেতে থাকে। তারপর তাদের পাতা খসে, ছাল ফাটে, ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে তারা পথচারীর বিস্ময় এবং আতঙ্ক উৎপাদন করতে থাকে। এর পরিশেষে আসে সেই শবদাহকের দল কবাতে কুড়ুলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় একটা গোটা শতাব্দীর স্মৃতি।

আমি বৃক্ষবিশারদ নই। নগর-পরিকল্পনার বিষয়েও আমার ধারণা খুবই ভাসা-ভাসা। কেউ যদি বলেন, বড়ো গাছকে মেরে ফেলা হয় এই জন্যে যে না-মারলে তারা যে-কোনো দিন উপড়ে পড়ে মানুষ মারবে, আমি তার জবাব দিতে পারব না।

তবে একটি কথা আমি বলব, এবং তা সাধারণ একজন পথচারীর

ধারণা থেকে। যতো গাছ মরে যাচ্ছে, ততো গাছ কি লাগানো হচ্ছে? না, হচ্ছে না। সাধারণ দৃষ্টিতে কলকাতা যে ক্রমে বৃক্ষ-বিরল হ'য়ে উঠছে এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমার আপত্তি সেইখানে।

উপরের ঐ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছত্রগুলি পরীক্ষা করুন, দেখবেন এক মহান বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে এর আড়ালে। গাছ 'মরু-বিজয়' করে, গাছপালা না থাকলে মাটি ক্রমে মরুভূমি হয়ে যায়। গাছের ঝরাপাতা, মরা শিকড় মাটিতে বালির ভাগ কমিয়ে তাকে শস্য-প্রসবিনী করে তার অজস্র জীবন্ত-শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থেকে বৃষ্টিজলের হাত থেকে ভূমিক্ষয় নিবারণ করে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টির দিনে রসের জোগান অব্যাহত রাখার জন্যে নিজের শিকড়ের চারিপাশে বৃষ্টিজলের সঞ্চয় ধরে রেখে মাটিকে সরস করে। তাছাড়া গাছ-পালার জন্যে হাওয়া স্নিগ্ধ থাকে, এবং বৈজ্ঞানিকরা বলেন, গাছের সবুজ আকর্ষণে মেঘগুলো বৃষ্টিপাত ঘটায় বেশী পরিমাণে।

কাজেই এহেন 'মরু-বিজয়ী' গাছ যে প্রকৃতই মানব-বন্ধু তা আশা করি তর্ক করে বোঝাতে হবে না।

দিল্লী অঞ্চলে নির্বিচারে বৃক্ষহত্যা কেমন ক'রে কীভাবে রাজস্থানী মরুভূমি আমাদের রাজধানী শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল, সে তথ্য আশা করি সকলেই জানেন। তারপর পরম যত্নে শুরু হ'য়েছে গাছ লাগানোর পালা।

আমাদের এখানেও আবহাওয়া গত কয়েক বছর ধরে কী রকম উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো শুষ্ক এবং উষ্ণ হয়ে উঠছে তা আশাকরি কাউকে বলে দিতে হবে না। জানি, এখানে 'বন-মহোৎসব' নামে

একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান কিছুকাল ধরে প্রচলিত হ'য়েছে। কিন্তু তার ফলে বৃক্ষসম্পদ কী পরিমাণে বেড়েছে সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তাছাড়া, এই আনুষ্ঠানিক কর্তব্য বাদ দিলেও, সারা বছরই এক্ষেত্রে করণীয় থেকে যায় অনেক কিছু।

বৃক্ষরোপণ একদা পুণ্য-কর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে। আগেকার রাজা-বাদশারাও রাস্তার ধারে গাছ লাগাতেন পথিকের সুবিধার জন্যে। শান্তিনিকেতনের দিগন্ত-জোড়া মাঠের মধ্যে আগে যেখানে একটি ছাতিম গাছ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তালকুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই প্রায় ছিল না, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বছরের পর বছর ধরে অপার মমতায় একটি ছায়াময় উপবন গড়ে তুলেছেন সে দৃষ্টান্তও চোখের সামনেই রয়েছে। কিন্তু এত জানা সত্বেও কলকাতা উষর হ'য়ে উঠছে। যেখানে একটি গাছ মারা যায় বা কাটা হয় সেখানে নতুন গাছ পোঁতা হয় না কেন সে এক বিস্ময়!

এ দায়িত্ব কার আমি জানিনে। সম্ভবত কর্পোরেশানই এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী। তা যদি হয় তবে আমি মুখ বন্ধ করলাম। কারণ পানীয় জল, অচল ড্রেন সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি প্রাণঘাতী সমস্যা নিয়ে ঐ অতিকায় প্রতিষ্ঠানটি এতোই আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে তাকে গাছের কথা বলা আর 'গাছে তুলে মই টান দেওয়া' প্রায় একই রকম রসিকতা।

কাজেই নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই বোধহয় আমাদের করার নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং এক-একটি মরা গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার পর সেই অপরিচিত শূন্যতার আকাশের দিকে চেয়ে প্রিয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করা! এই আমাদের নিয়তি!

## ॥ বারো ॥

সেদিন চা-পানের জন্যে এক রেস্তোঁরায় ঢুকে সুশান্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সুশান্তকে আপনারা কেউ চেনেন না। আমিও তেমন কিছু চিনতাম না। একসঙ্গে এম-এ ক্লাসে যাতায়াত করেছি, একটু মুখ চেনা ধরণের পরিচয় ছিল এই আর কি! কিন্তু বহুদিন পর ছাত্রজীবনের সামান্য পরিচয়ও নতুন আলাপের সূত্রপাত হ'য়ে উঠতে পারে। বিশেষত আপনার সহপাঠী যদি সামাজিক মনোভাবের মানুষ হয় তাহলে তো কথাই নেই।

তা সুশান্ত সত্যিই আলাপী মানুষ বটে। অনেক আশ্চর্য তথ্য জানতে পারলাম সুশান্তের ঐ আধ ঘণ্টার কথাবার্তায়। সেবারে সে এম-এ পরীক্ষা দিতে পারেনি, বাড়ির গোলমালে চাকরীতে ঢুকে পড়তে হয়েছিল। তারপর বিবাহ এবং পরিবার-বৃদ্ধি। ফলে শুরু হল ছাত্র পড়ানো। অবশেষে ছাত্রদের উৎসাহেই সে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বসেছিল এবার। পাশও করেছে।

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছাত্রের তাগিদে টিউটর কেন পরীক্ষা দিতে যাবে?

সুশান্ত হেসে বলল, 'সত্যি ভাই এ এক তাজ্জব কাণ্ড। আমার ছাত্রেরা টপাটপ সব ডি-ফিল পেয়ে গেল দেখে মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। শেষে ওদেরই একদল এসে আমাকে বলল, আপনার

এত জ্ঞান, আপনি স্যার নির্ঘাৎ ডক্টরেট পেয়ে যাবেন, শুধু একবার এম-এ-টা পাশ ক'রে নিন আগে। শুনে ভারি লোভ হল মনে। দিয়ে দিলুম পরীক্ষা। তা সেকেণ্ড ক্লাস একটা পেয়ে গেছি বরাত গুণে।'

'তাই নাকি?' খুশি হতেই হল আমাকে। প্রশ্ন করলাম, 'এবার থীসিসের কথা ভাবছ বুঝি?'

'ভাবনা তো কতো রকমেরই মাথার মধ্যে আসছে, সিলেক্ট করিনি কিছু। তাছাড়া তিন বছরের আগে তো হবে না, দেখি আরো কিছুদিন ভেবে।' বলে সে সহসা একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'ভালো কথা, তোমাকেই জিগ্যেস করি। তুমি তো সাহিত্যিক, বল তো কোন সাবজেক্টটা ঠিক জুৎসই হয়! একটা বিষয় আছে—যতীন সেনগুপ্তের উপর বৌদ্ধপ্রভাব। আরেকটা হল—মনঃসমীক্ষকদের দৃষ্টিতে সুকুমার রায়ের হাস্যরস। কিন্তু আমার মনে হয় এ দুটোর চেয়েও স্ট্রাইকিং হবে—বাংলা কাব্যে ভূমা বনাম ভূমি। কিছু কায়দাকরণও আমি আঁচ করে ফেলেছি এর মধ্যে। উপনিষদে কোথায় কোথায় 'ভূমা' কথাটির প্রয়োগ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করে দিতে বলেছি আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুকে। সেইটে পেলে আমি দেখব ভূমার ধারণাটা ভক্তিবাদ না জ্ঞানবাদের ফসল। সেই সঙ্গেই আসবে বৈষ্ণব শৈব এবং শাক্ত মতবাদের বিচার। তারপর সেই তথ্য এনে ফেলব রবীন্দ্রকাব্যের উপর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোথায় কোথায় 'ভূমার' প্রয়োগ করেছেন তারও একটা ক্যাটলগ তৈরি করতে হবে এই সঙ্গে। অন্যদিকে হল 'ভূমি'। এই আইডিয়াটি আর্য কিংবা অনার্য তাই বিচার করে দেখব আগে।

সেইসঙ্গে আসবে পশুচারণ আর কৃষির কথা। সঙ্গে সঙ্গে উঠবে 'তন্ত্র', অথর্ববেদ এবং আয়ুর্বেদের কথা। এর পর বৌদ্ধতন্ত্র এবং শাক্ততন্ত্রের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে চর্যাপদ এবং মঙ্গলকাব্য। বুঝতেই পারছ, তারপর লোক সাহিত্য, ঈশ্বর গুপ্ত, ইত্যাদি হ'য়ে বাংলার রেনেসাঁস এবং ক্যালকাটা কালচার পর্যন্ত আসা খুবই সহজ ব্যাপার। আর এইভাবে ভূমা ও ভূমির দুই ঐতিহ্যকে আমি তুলনা ও প্রতিতুলনায় ফেলে বিচার করে দেখব রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে।...কেমন মনে হচ্ছে তোমার ?'

সত্যি বলতে কি, মাথা ধরে গিয়েছিল। কাজেই সংক্ষেপে বললাম, 'ভাল।'

সুশান্ত উৎসাহিত হ'য়ে বলল, 'মস্ত বড় কাজ হবে একটা বুঝলে। উপাদান জোগাড় করেছি অনেক। সাহিত্য থেকে স্থাপত্য, ভিস্ট্রি থেকে কেমিস্ট্রি, কিছুই বাদ দিইনি। ওদিকে ব্রহ্মবাদ থেকে বস্তুবাদ, বাংলাদেশের সঙ্গে স্পেন ও পর্তুগালের বাণিজ্য সম্পর্ক, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-সাহিত্য গাছগাছড়া ও পশুপাখির উল্লেখের তালিকা, ভারতের ভূ-প্রকৃতি এবং খনিজদ্রব্য, কৃষির বিবর্তন এবং নানারকম আদিবাসীদের টটেম ও টাবু, বাঁশ কাঠ ও লোহার তুলনামূলক গুরুত্ব, বাংলাকাব্যে শব্দ-ব্যবহারের বিবর্তন এবং ছন্দোবৈচিত্র্য, ধ্বন্যালোক ও ক্রোচে, এমন কি ওরিজিন অব অ্যাবরিজিন্যাল মিথ পর্যন্ত সব কিছুই পাবে আমার থীসিসে। আর এছাড়া উপায়ও নেই। আমার ছাত্রদের চাইতে তো আমি পিছিয়ে থাকতে পারিনে ! কি বল ?'

'সে তো বটেই।' আমি খাবি খেতে খেতে বললাম।

সুশান্তের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আমাকে একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে মনে করে বেশ একটা আত্মপ্রসাদের ভাব দেখা দিল তার।

দেখে, একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়, বললাম, 'দেখো ডক্টর বাহার মতো ফ্যাসাদে না পড় আবার!'

'কি রকম? ডক্টর বাহাই বা কে?'

'কেন, ডক্টর শুভাস্কর বাহার নাম শোনোনি? এই তো বছর দুয়েক আগে বাংলা সাহিত্যে কান্নার ইতিহাসের উপর থীসিস লিখে ডি-ফিল পেয়েছেন ভদ্রলোক!'

সুশান্ত নিষ্প্রভভাবে হেসে বলল, 'কান্নার ইতিহাস? তা বেশ সাবজেক্ট তো! কি হ'য়েছিল তাঁর?'

'কান্না। মানে কাঁদতে হ'য়েছিল তাকে'। আমি বললাম, 'কেঁদে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।"

'কেন, কেন?' সুশান্তের গলায় শুধু কৌতূহল নয়, ঈষৎ ভয়ের আভাসও পাওয়া গেল।

খুশি হ'য়ে আমি বলতে লাগলাম, ডক্টর বাহা কিছুকাল আগে এক মফঃস্বল কলেজের লেকচারার হ'য়ে সপরিবারে কর্মস্থলে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন একেবারে পাণ্ডববর্জিত জায়গা, তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষের বাস নেই বললেই চলে। ফলে প্রায় কারো সঙ্গেই তাঁর আলাপ পরিচয় হল না। ফাঁকা জায়গায় একটা দোতলা বাড়ি পেয়ে তিনি কেতাদুরস্ত নেমপ্লেট লাগিয়ে নিজের মতো বাস করতে লাগলেন। তারপর মাস ছয়েক যেতে না যেতেই ঘটল সেই মারাত্মক ব্যাপারটা। একদিন গভীর রাতে সদর দরজায় শোনা

গেল উপর্যুপরি করাঘাত। ঘুম ভাঙা চোখে ভীত ত্রস্তভাবে ডক্টর রাহা উপরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখেন, চার-পাঁচজন গ্রাম্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারো হাতে লাঠি, কারো বা লণ্ঠন। ডাকাত নাকি? ডক্টর রাহা নীরবে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের একজন ইতিমধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে ডাক্তারবাবু বেরিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে সকলে উপরের দিকে তাকাল, এবং মিলিত কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে তাঁকে নিচে নেমে আসতে বলল। ফলে ডক্টর রাহাকে নামতে হল। নেমে তিনি শুনলেন, মাইল দুয়েক দূরে এক গাঁয়ে কলেরা লেগেছে, তক্ষুনি তাঁকে একবার যেতে হবে। শুনে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কলেরা দূরস্থান, কারো পেটব্যথা শুনলেও তাঁর হাত-পা হিম হয়ে যায়। বললেন, তিনি তো ডাক্তার নন, একজন ডাক্তারকেই এখন নিয়ে যাওয়া দরকার। তারা বলল, ডাক্তার বলেই তো তাঁর কাছে আসা—পাশে লেখা আছে, তিনি ডাক্তার। তখন তাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হল—

ডক্টর রাহা। আমি তো সে ডাক্তার নই ভাই!

তাদের একজন। সে ডাক্তার নন মানে? এই তো দিব্যি লেখা রয়েছে: গেঁয়ো মানুষ পেয়ে বোকা বানাচ্ছেন, অ্যাঁ? নাকি ভিজিট দেব না?

ডঃ রাহা। না না, তা কেন? আমি চিকিৎসা করার ডাক্তার নই, বুঝলে ভাই।

অন্য ব্যক্তি। বুঝেছি, ভিজিট বেশি চান, এই তো? তা দেব'খন বেশি।

ডঃ রাহা। কি মুস্কিল! আমি যে ডাক্তারই নই? দেখছ না, আমার ডাক্তারখানা নেই?

অন্য ব্যক্তি। ডাক্তারবাবু, না হয় মানলাম আপনি হোমোপাথী করেন। তা সেই ওষুধই দেবেন চলুন না!

ডঃ রাহা। (রাগতভাবে) এ তো আচ্ছা মুস্কিল! বলছি আমি ডাক্তার নই—

তারা। (ততোধিক রাগতভাবে) আলবৎ ডাক্তার! ভালো চান তো চলুন।

ডঃ রাহা। তার মানে?

তারা। (হাত ধরে) মানে, যেতেই হবে।

তারপর টানাটানি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। শোরগোল শুনে লোকজন এগিয়ে এল চারদিক থেকে। শেষে তাদের মধ্যস্থতায় রক্ষা পেলেন ডক্টর রাহা। পরদিন চাকরী ছেড়ে কলকাতায় পলায়ন।...বোঝ একবার ঠেলা!'

সুশান্ত বলল, 'যাঃ সব তোমার বানানো।' কিন্তু মুখ থেকে তার চিন্তার ছাপ গেল না।

সেইটুকুই যা আমার নীট লাভ!

## ॥ তেরো ॥

আমরা, বাঙালীরা, খুবই সংস্কৃতি-অনুরাগী জাত। আর বাংলা

দেশ বলতে যেহেতু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেবল কলকাতা শহর, সেইহেতু আমাদের সংস্কৃতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা যে দেখা যাবে এই শহরেরই চৌহদ্দির ভিতরে তাতে আর আশ্চর্যের কি।

বাংলার মেলা নাকি এক অতি উত্তম সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের উপায়। যে যুগে, যে প্রয়োজনে এই মেলাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল সেই যোগাযোগের ব্যবস্থাহীন যুগের সবপ্রকার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ আজ বহুদূরে অপগত হলেও আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে কলকাতার বুকে বছরের পর বছর ধরে নানা উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়ে আসছি। অথচ এ শহরে তো প্রতিদিনই মেলা বসে আছে। বড়বাজার বাদ দিলেও, কলেজ ষ্ট্রীট শিয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়ে, বা জগুবাজার বা গড়িয়াহাটের মোড়ে বিকেল এবং সন্ধ্যের দিকে যে রকম নরনারীর সমাগম হয়, প্রকৃত মেলাতেও তেমন হয় কিনা সন্দেহ।

তবু আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা বসে এবং লোকও আসে। এসব জায়গায় ভাবী ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের প্রদর্শনীর পাশে পাঞ্জাবী চাটের দোকান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সমাবেশের কাছে নাগরদোলার ব্যবস্থা এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্টরের সন্নিহিত কৃষ্ণলীলার তাঁবু সত্যিই এক বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে দর্শকের সামনে। কিন্তু সেটা বোধহয় বড় কথা নয়, অন্তত উদ্যোক্তাদের কাছে তো বটেই। বড় কথা হল সংস্কৃতি। তাই মেলা-প্রাঙ্গণের গাছগুলিতে লাগানো হয় লাল-নীল বৈদ্যুতিক বাল্ব, উচ্চকিত অ্যাম্প্লিফায়ারে গ্রামো-ফোন রেকর্ড বাজানো হয়, 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন

আপনি…' এবং চায়ের স্টলে চেয়ার খালি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে অবশ্য নির্ধারিত মঞ্চে বক্তৃতা আছে, লোকসঙ্গীত আছে এবং আছে ফিল্ম শো।

আমি শুনেছি, বরণীয়া শিক্ষানেত্রী শ্রীযুক্তা মন্তেসরীর শিক্ষা প্রণালী, যাকে বলে 'মন্তেসরী পদ্ধতি' তার মূলকথা হল—আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদান। মেলার ভিতর দিয়ে আমরা যা সংস্কৃতি-অনুরাগ সঞ্চয় করি তারও মূলকথা হল আনন্দ। সেদিক থেকে আমাদের এই 'মন্তেসরী পদ্ধতি'র সাংস্কৃতিক শিক্ষা যে অত্যন্তই উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঈষৎ-সচ্ছল বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে এই সংস্কৃতি-অনুরাগের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাতে অবশ্য একটু হোঁচট খেতে হয়।

সূচনাটা হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে থাকতেই। শান্তি-নিকেতনী মোড়া, নিচু তক্তপোষ, আধুনিক চিত্রকরের দু' একটি ছবি দেখা যাচ্ছিল পনের-বিশ বছর আগে থেকেই। ইদানীং বছর কয়েকের মধ্যে এই গৃহসজ্জার ব্যাপারে উপকরণ-বৈচিত্র্য ঘটেছে অসম্ভব রকম।

সত্যিই তো, মুখ যেমন মানুষের মনের দর্পণ, তেমনি বাড়ির বসবার ঘরটির রূপসজ্জা সমস্ত পরিবারটির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে বইকি! তাছাড়া নিছক বসবার ঘরটির বৈশিষ্ট্যেই যদি সংস্কৃতি-বান বলে ছাড়পত্র পাওয়া যায় তো সেদিকে যে সকলেরই নজর পড়বে সেটাও বিচিত্র নয়। ফলত, হয়েছেও ঠিক তাই। পরন্তু-

রামের গল্পে যে গৃহিণীটি ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত বিদ্যালাভ করে স্বামীকে 'হোয়াট' 'হোয়াট', 'হোয়াট' বলে চমকিত এবং পুলকিত করে তুলেছিলেন, তেমন গৃহিণী হয়তো আজ অনেক পরিবারেই নেই। কিংবা যে গৃহিণী যুদ্ধের সময় শাদা উল দিয়ে কার্পেটের উপর নীল বিড়াল বুনে সাধারণের অবগতির জন্যে তার নিচে ইংরাজাতে লিখে দিয়েছিলেন 'দি ক্যাট', তেমন গৃহিণীও বোধকরি আজ দান স সা –মালো করে নেই। কিন্তু যাঁরা আছেন তারা সকলেই যে খুব একটা সুরুচির পরিচয় দিচ্ছেন এমনও বলা যায় না। বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে এমন সব জিনিস বৈঠকখানায় জড়ো করছেন তার যার মাথামুণ্ড খুঁজে পওয়া কঠিন।

কাঠের পুতুল খুবই সুন্দর জিনিস পুরোনো পোড়া-মাটির পুতুলও অতি অপূর্ব। স্থান পেল ঘর সাজানোর কাজে। ভালো কথা। কিন্তু তার পাশেই দেখা যাবে দেয়ালের উপর ঝুলছে একটি মাদুর, দুটি সোলার মালা এবং তিনটি পাখা-মেলা কাঠের হাঁস—থাকে থাকে উড়ছে। অন্য দেয়ালে একটি চিত্রিত চ্যাটাই, তার দুপাশে বঙকর, বাঁশের আধারে দুটি নধরকান্তি সবুজপত্র লতা—যার পয়মন্ত নাম হল 'মানি প্ল্যান্ট।'

ফলে দাঁড়াল এই যে, প্রমাণিত হল, আপনি একজন রুচিবান, বিদগ্ধ মানুষ। পুতুল, মাদুর, মালা, চ্যাটাই, এসব দেখাল আপনি মনেপ্রাণে বাঙালী, বাংলার দেশজ ঐতিহ্য এবং লোকশিল্পের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আবার সেই সঙ্গেই 'মানি প্ল্যান্ট' অভিমানী দেহহিল্লোলে বুঝিয়ে দিল আপনি আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনারও অংশীদার।

এরপরে সে ঘরে যদি কেউ নাইলন শাড়ীতে সুসজ্জিতা হ'য়ে চড়া রঙের পদ্মফুল-আঁকা বরণডালার উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আবির্ভূতা হন তো সোনায় সোহাগা। একই লগ্নে আপনি শ্রাবস্তী এবং প্যারিসের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরে ধন্য হবেন।

এমনই ধরণের এক বাড়িতে আমি মসৃণ নারকেলের মালায় ফ্রিজে-রাখা ঠাণ্ডাজল পরিবেশিত হতে দেখেছি; অন্যত্র আতঙ্কিত হয়েছি দেয়ালের গায়ে ছুখানি কুলো ঝোলানো দেখে। সে বাড়িতে ভদ্রমহিলারা কেউ কুলো দিয়ে চাল-ডাল ঝাড়তে উৎসাহী বলে অনুমান করতে পারিনি বলেই সন্দেহ হয়েছে ও-ছুটির ব্যবহার হয়তো অবাঞ্ছিত অতিথিদের বাতাস দিয়ে বিদেয় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ! সমস্ত সময়টা বেশ আড়ষ্টভাবে কাটাতে হয়েছিল আমাকে।

রুচি বস্তুটি বড়ই অদ্ভুত। যার নেই সে বুঝতেই পারে না কোথায় তার ঘাটতি। সস্তা অনুকরণে চোখ-ধাঁধানোর দিকেই তখন ঝোঁক পড়ে যায় বেশী, কী করছি বা কেন করছি, সেদিকে আর খেয়াল থাকে না। কিন্তু ঘর সাজানোর ব্যাপারটা তো শুধু আজব কিছু করার বাহাদুরি নয়, নিজের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্নই যে ওর সঙ্গে জড়িত। তাই সে ব্যাপারে একটু চিন্তা করতে হয়। নকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নকলস্য নকল উপকরণের যত্রতত্র ব্যবহারে কেবল রুচিদৈন্যই প্রকটিত হয়, পরিবারের বিষয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান তাতে মেলে না।

আমাদের সংস্কৃতি-পিপাসু হবু-অভিজাত নরনারীকে এ বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ করি।

## ॥ চোদ্দ ॥

সেদিন আমাদের আড্ডায় কথা হচ্ছিল কুস্তি নিয়ে। সাধারণত এসব দৈহিক পরাক্রমের বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনে। রাজনীতি, ক্রিকেট, বাজার দর, সিনেমা ইত্যাদি নিরাপদ ব্যাপারের মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখি। কিন্তু আমাদের আড্ডার প্রাচীনতম সদস্য হরেনবাবু সম্প্রতি ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিলেন, সেদিন হঠাৎ তাঁকে আড্ডায় আবিষ্কার ক'রে তার ঐ অদর্শনের কৈফিয়ৎ তলব করতেই কুস্তির কথা উঠে পড়ল।

না, হরেনবাবু নিজে কুস্তি করেন না। তিনি আমার-আপনার মতোই একজন জীর্ণদেহ বাঙ্গালী এবং কায়ক্লেশে অফিস আর টিউশানী করে সংসার নির্বাহ করেন। তার মুখে কুস্তি-প্রশস্তি শুনে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর অবাক হয়ে গেলুম। আশুতোষ বয়সে অনেক কাঁচা, সে বলল, 'কিন্তু হরেনদা, এ বয়সে ওসব কসরৎ কি আর শরীরে সইবে!'

হরেনবাবু উচ্চহাস্য করে বললেন, 'আমি কি আর শরীর দিয়ে কুস্তি করছি? আমার কুস্তি মনে মনে। এতে মন পুষ্ট হয়।'

বিজন এক কোণে ব'সে ছিল। সে আর্টিস্ট মানুষ, সর্বদাই যেন ক্লান্ত এবং উদাসীন। হরেনবাবুর কথায় সে প্রতিধ্বনি করল, 'মন পুষ্ট হয়?'

'নয়তো কী ?'

'আমার মনে হয়, ওতে মন দুষ্ট হয়—কালিমালিপ্ত হয়।'

'একেবারে বাজে কথা। দুজন সুগঠিতদেহ পুরুষসিংহ পরস্পরের সঙ্গে লড়ছে, এতে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে না ? তোমার কি মনে হয় বিজন যে আনন্দ কেবল পটে-আঁকা ছবিতে ? বাস্তবে কোন আনন্দ নেই।'

'হয়তো আছে।' বিজন মৃদুহাস্য সহকারে বলল, 'বিশেষ করে সে বাস্তবে যদি থাকে কিল-চড়, লাথি, চুল-ওপড়ানো এবং মাথা ফাটিয়ে দেওয়া।'

হরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, আমি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'না হরেনবাবু, চেঁচালে চলবে না। বিষয়টা কী, তাই আগে বোঝা যাক। আসল কথা হল, আপনি বলছেন, কুস্তি দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে, আর তারই ফলে আমাদের মন পবিত্র হয়। কিন্তু বিজন বলছে, কুস্তির আনন্দ পাশবিক, ওতে মন কলুষিত হয়। বাস, আপনি এক-এক করে উত্তর দিন।'

হরেনবাবু একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন, 'একেবারে সক্রেটীসের বিচার। কিন্তু হেমলক কই ?'

আমি লজ্জিত হয়ে বাড়ির ভিতরে কফির জন্যে ফরমাস পাঠালাম। হরেনবাবু বললেন, 'প্রথম কথা হল, বিজন ভায়া যে সব বর্ণনা দিল ফ্রি ষ্টাইল কুস্তিতে ওসব ব্যাপার তেমন কিছু হয় না, ওসব হল ক্যাচ-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান কুস্তির ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কুস্তিটা হয় দুজন সমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে। আমার মতো লোকের সঙ্গে একজন ভীম

পালোয়ানের হয় না। কাজেই এর মধ্যে বীভৎসতা কিছুই থাকে না—থাকে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের প্রতিযোগিতা। তৃতীয়ত, এ ধরণের কুস্তি যেহেতু একটা স্পোর্ট সেইহেতু সব খেলাই যেমন মনকে পবিত্র করে কুস্তিও সেই রকমই করে। মন কলুষিত করার কোনো সম্ভাবনাই এতে নেই।'

অমুতোষ সায় দিয়ে বলে উঠল, 'আমারও তাই মনে হয়, হরেনদা। শক্তি চর্চা না করেই বাঙালি ডুবতে বসেছে। শরীরটা এ০। অবহেলার জিনিস নয়, তাকে সুস্থ না রাখলে সে০ আমাদের পদে পদে অপদস্থ করে ছাড়ে।'

বিজন তার কথার কোনো জবাব দিল না। হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'অাচ্ছা হরেনদা, বীয়ার হাগ বা ভল্লুক আলিঙ্গন জিনিসটা কী রকম?'

'মার্ভেলাস। একজন মল্ল যখন অ।রেকজনকে বুকে জাপটে ধরে ভয়ানক চাপ দিতে থাকে তাকেই বলে বীয়ার হাগ। বাছাধনের আর তখন টঁ-শব্দ করার উপায় থাকে না।'

'ঠিকই তো আর ঐ বস্টন ক্র্যাব, ওটা কী রকম প্যাঁচ?' নিরীহভাবে প্রশ্ন করল বিজন কিন্তু তার আপাত নিরীহতার অন্তরালে আমি যেন ঝড়ের সংকেত অনুভব করলাম। হরেনবাবু সব বোধ হয় লক্ষ্য করলেন না। সোল্লাসে তিনি বলতে শুরু করলেন—

'বস্টন ক্র্যাব? একেবারে মোক্ষম প্যাঁচ। মনে কর, তোমার প্রতিপক্ষকে তুমি উপুড় করে ফেলে দিয়েছ, তারপর তার পা দুখানি উঁচু করে তুলে চাপ দিয়ে। একটু নড়েছে কি শিরদাঁড়া ভেঙেছে।

ঠিক যুযুৎসুর মতো। হার স্বীকার না ক'রে কোন রাস্তা নেই।'

'অর্থাৎ, হয় হার স্বীকার, নয়তো হাড় ভাঙা। বেশ বেশ। আর ঐ এরোপ্লেন স্পিন, ওটা কী বস্তু?'

'খুবই সোজা। ধাঁ করে প্রতিপক্ষকে চিৎ করে দুহাতে মাথার উপর তুলে বোঁবোঁ ক'রে ঘোরানো। বেশী ছটফট করলেই পতন ও মূর্ছা।'

'শুধু কি তাই? রক্তবমন ও মৃত্যু, তাই বা বাদ থাকে কেন?' বিজন ফেটে পড়ল হঠাৎ, 'হরেনদা, আপনার উচিত তীর-ধনুক হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং জীব-জন্তু মেরে তার কাঁচা মাংস খাওয়া। দেখবেন, সেও খুব উত্তম ধরণের একটা স্পোর্ট!'

'নাঃ, তা করব কেন?' হরেনবাবু জ্বলে উঠে বললেন, 'ঘরের মধ্যে বসে নন্দনতত্ত্ব আলোচনা করব আর ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাব!'

বিজন উত্তেজিতভাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'অর্ডার, অর্ডার! এ সব ব্যক্তিগত আক্রমণ চলবে না। তাছাড়া,' ভিতরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'আপাতত মুখকে ব্যাপৃত রাখার অন্য উপায় এসে গেছে। এখন পাঁচ মিনিটের জন্যে বিরতি।'

সকলেই যার-যার আলু ভাজার প্লেট এবং কফির কাপ তুলে নিলেন। ভৃত্য ট্রে নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, 'আসল কথা হল, রুচি। সকলের সব জিনিস ভালো লাগে না।'

'ওটা নতুন করে না বললেও চলে।' বিজন বলল, 'কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকলেরই ভালো লাগা উচিত— যেমন

সূর্যোদয়, গান বা শিশুর মুখ। আবার অন্য কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকলেরই খারাপ লাগা উচিত—যেমন পচা ইঁদুর, বস্তীর ঝগড়া বা কুস্তি।'

'কখখনো নয়।' অনুতোষ বলে উঠল, 'বিজনবাবু আর্টিস্ট হয়ে কী করে যে কুস্তিকে পচা ইঁদুরের সঙ্গে এক ক্লাসে ফেললেন বুঝতে পারিনে। মল্লবীর যখন এসে সকলের সামনে দাঁড়ায় আমার তো দেবদূতের মতো মনে হয়। কী অপূর্ব ফর্ম থাকে এক-একজনের যদি একবার দেখতেন তো বুঝতেন।'

'ঠিক বলেছ।' হরেনবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'আমার তো নেশা ধরে গেছে। খবর পেলেই দেখতে যাই।'

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।' বিজন বিষণ্ণভাবে বলল, 'আপনার ভিতর যে জন্তুটা মানুষটা লকিয়ে আছে তারই খোরাক জোটাতে যান আপনি কুস্তি দেখতে। আসলে আপনি একটি স্যাডিস্ট, কাউকে পীড়ন করলে আনন্দ বোধ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তা হয়তো সম্ভব নয়। তাই আপনি বকলেম কাজ সারেন।'

হরেনবাবু এই আকস্মিক আক্রমণে কেমন থ' বনে গেলেন। উদভ্রান্তভাবে বলতে লাগলেন শুধু, 'বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা। আমি ভ বতেও পারিনে।'

'সে তো ঠিকই। তা বলে আপনি লজ্জা পেতেন, যেতেন না।' বিজন বলল, 'সুন্দর সুগঠিত দেহ কার না ভালো লাগে? অনুতোষ ঠিকই বলেছে, এক-একজন মল্ল যেন ভাস্কর্যের প্রতীক। কিন্তু কথা কি জানেন, কুস্তির সময় তারা যে সব কাণ্ড করে, যেমন গরিলার

মতো গর্জন করা, চুল ওপড়ানো, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া, এ সব শুধু দর্শকদেরই মনোরঞ্জনের জন্যে। এ সব বীভৎসতা না থাকলে এত লোক দেখতে যেতো না, পয়সা উঠত না। কাজেই এটা হলো ব্যবসাদারী। ব্যবসার জন্যেই তাদের পড়ে-পড়ে এমন মার খেতে হয়। কী করুণ ব্যাপার ভাবলেও আমার কষ্ট হয়। অথচ আমাদেরই আদিম নিষ্ঠুরতাকে খুশি করার জন্যে এত আয়োজন!...হয়তো এককালে আমরা নরবলি দিয়েও এমনি উল্লাস অনুভব করতুম।'

আড্ডার ভিতর একটা থমথমে আবহাওয়া নেমে এল। আমি জোর করে হেসে বললাম, 'বিজন, তুমি তুলি ছেড়ে কলম ধর। আমার মনে হয় পৃথিবীতে তাহলে অচিরাৎ স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে।'

শুনে সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সেদিনের মতো আমাদের কথার কুস্তি সাঙ্গ হল।

## ॥ পনেরো ॥
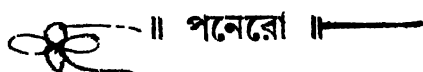
আজ আমি আপনাদের রাস্তার গল্প শোনাব।

রাস্তার গল্প মানে অবশ্য 'রাজপথের' কথা নয়। সে গল্প শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।...'আমি রাজপথ। অহল্যা' যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর

বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়-শয়নে শয়ান রহিয়াছি।'...এমন ধরণের কল্পনাশক্তি আমার নেই, এত বিরাট পটভূমিতে বুঝি এখন আমাদের মন তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। তাই আমি ছোট চৌহদ্দিতে নিজেকে বাঁধছি। তারই গল্প শোনাতে চাইছি আজকে, যে-রাস্তায় আমাদের প্রতিদিনের যাতায়াত। আমি কলকাতা শহরের রাস্তার কথা বলছি।

ভয় নেই, রাস্তায় এনে দাঁড় করালেও শেষপর্যন্ত পথে আমি আপনাদের বসাব না। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই যেসব অসমধুর কাহিনী আপনাদের মুখস্থ শক্তিকে তীব্র ক'রে তোলে তার আমি পুনরাবৃত্তি ঘটাব না। পাঁচ মিনিট বৃষ্টি হলে কোথায় কোথায় জল জমে, দশ মিনিট বৃষ্টি হলে কোন্ কোন্ রাস্তা প্রেস-ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা-আলোকিত করে, তা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তারপর বৃষ্টিপাতের ফলে যানবাহন বিকল হওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স্ও আমাদের নখদর্পণে। রাস্তায় কতখানি করে জল জমলে পরপর ট্রাম, একতলা বাস ও দোতলা বাস বন্ধ হয়, এসবও আমরা ভালো করেই জানি। কাজেই সেদিকে আমি যাব না।

বরং আর একটা অন্য গল্প ফাঁদা যাক। রাস্তা যেখানে রাস্তা নয়, রাস্তার সেই চরিত্রের কথা স্মরণ করা যাক আজ।

কথাটা একটু গোলমেলে, না? রাস্তা অথচ রাস্তা নয়, সে আবার কেমন ব্যাপার? এমন কিছু কঠিন নয়। রাস্তা কথাটার মানে কি? শব্দকল্পদ্রুম হাতের কাছে নেই. কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্ভয়ে বলতে পারি—কোনো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াই রাস্তার স্বধর্ম। যেমন ধরুন, বাড়ি থেকে আপিস, এবং আপিস

থেকে বাড়ি। কিংবা বাড়ি থেকে ব্যবসার জায়গা, এবং ব্যবসার জায়গা থেকে বাড়ি। অথবা বাড়ি থেকে বাজার, সিনেমা হল বা খেলার মাঠে যাওয়া এবং আসা। এর বাইরে রাস্তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ রাস্তা হল আমাদের যাতায়াতের অবলম্বন। কিন্তু সকলের কাছেই কি রাস্তা তাই? না, তা নয়। এমন লোকও আছে এবং কলকাতার মতো শহরে বেশ যথেষ্ট সংখ্যাতেই আছে, রাস্তা যাদের অবলম্বন নয়, লক্ষ্যস্থল। ঘর থেকে বেরিয়ে তারা রাস্তাতেই আসে, এবং রাস্তা থেকেই তারা ঘরে ফিরে যায়।

এমন লোক কি আপনি একটিও দেখেননি? দেখেছেন বৈকি! ভিখিরিদের কথা ভাবুন না। ঘর তাদের ঠিক কোথায় আছে জানিনে, হয়তো সকলের তা নেইও, কিন্তু রাস্তা ছাড়া এরা যে কোথাও যায় না, এ তো আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু ভিখিরিরা অন্য জাতের মানুষ, তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। তারা মানব-সমাজের কাছাকাছি বাস করলেও সমাজের ঠিক মাঝখানে নেই। কাজেই ওদের সঙ্গে সমাজবাসী মানুষদের এক করে দেখা যায় না। আমরা বরং অন্য দৃষ্টান্তে আসি।

যেমন ধরুন ফিরিওয়ালা, বা ফুটপাতের দোকানি। রাস্তার সঙ্গে এদের বাঁধন প্রায় অচ্ছেদ্য বললেও বেশী বলা হয় না। কিন্তু দশ মিনিটের মাপে একটা মাঝারি রকমের বৃষ্টি হলেও রাস্তায় যখন জলরেখা হাঁটু ছাড়িয়ে যায়, এদের তখন কী দশা দাঁড়ায় কখনো ভেবে দেখেছেন কি?

পুরনো কাগজ শিশি-বোতল, ছিটকাপড়, ল্যাংড়া আম নিয়ে এদের অনেককেই আপনারা বৃষ্টির সময় ছুটে গিয়ে কোনো গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় নিতে দেখেছেন। তারপর, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, রাস্তায় জলের চাপ যতো ঊর্ধ্বগতি হয়েছে এদের মুখের চেহারাও ততো হতাশ হয়ে উঠেছে। হবে নাই বা কেন? একটি দিনের রুজি মারা গেলে একটি দিনই যাদের না-খেয়ে কাটাতে হয়, রাস্তায় জল জমলে নিশ্চয়ই তাদের মনে কবিত্ব-ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক নয়!

আর ঐ ফুটপাথের দোকানী। তাদের কথা বলার আগে আমি অনুরোধ করব, তাদের দোকানগুলোর দিকে একটু নজর দিয়ে দেখতে।

প্লাস্টিকের ছোটখাট জিনিস, চুলের ফিতে, সেফটিপিন, কেবল এইটুকু সম্বল নিয়েই হয়তো কেউ বসে আছে সারাদিন ডালহৌসির ফুটপাতে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে কাউকে দেখা যাবে কাপড় আটকাবার ক্লিপ, জুতোর কালি, ছুঁচ, সুতোর গুলি নিয়ে বসে আছে। সেদিন একজনকে দেখেছিলাম, তার দোকানে শুধু গোটাকয় ডবমা, খুলে খুলে মন্দিরের মতো উঁচু করে রাখা। তাছাড়া দামী কাপড়িস কিংবা সস্তা ব্লাউজ-পিস অথবা বেলোয়ারী কাঁচের ও প্লাস্টিকের চুড়ি দিয়ে দোকান সাজায় কতো-জনে, তার হিসব রাখবে কে? গড়িয়াহাটের মোড়ে একজনকে দেখেছি শুধু ফলের মালা বিক্রি করতে। শেয়ালদার কাছে আরেক-জন বৃদ্ধ কেবল একটি ওজন নেবার যন্ত্র নিয়ে বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে চ্যাঁচায়—আইয়ে বাবু, আইয়ে। ওদিকে রাজভবন বা

ওয়েলিংটনের কাছে যারা বসে থাকে তাদের মুখে দেখেছি অপার নিস্পৃহতা, কারণ তারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—তাদের চেয়েও হা-ঘরে কেউ এসে হাত না পাতা পর্যন্ত তাদের ধ্যানভঙ্গ হতে চায় না।

এই বিচিত্র জনসমষ্টি, আশ্চর্য এদেব জীবিকা, কী করে দিন চালায় জানিনে—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বাস্তায় জল জমতে শুরু করলে এরা যে কী পরিমাণ অসহায় হযে পড়ে তা আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। তপ্ত খোলা থেকে খৈ ছিটকানোর মতো দিগ্বিদিকে ছুটতে থাকে এবা ছোট্ট একটি ছাউনি আর সামান্য একটু শুকনো জায়গার জন্যে। কিন্তু কলকাতা প্রাসাদপুবী হলেও বৃষ্টিব দিনে ও-দুটি জিনিস এতো সহজে মেলে না। কাজেই যে যার বেসাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা জলের মধ্যেই। দেখে মনে হয় নতুন প্রজাতির কোনো জলচর প্রাণী!

এদের জন্যে কোনোদিকেই কোনো আশ্বাসের আভাষ নেই। শোনা যাচ্ছে, ময়লা জল নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো নাকি কাদা-ময়লায় আকণ্ঠ বুজে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, ময়লা-তোলার কর্মীরা নাকি কাজে সহযোগিতা কবেনি। শোনা যাচ্ছে, ময়লা তুললেও নাকি কলকাতাব ড্রেনগুলো দেড় ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হলে জল বইতে পারত না। শোনা যাচ্ছে আরো অনেক কিছুই। শুধু শোনা যাচ্ছে না সেই কথাটিই যে কথা শোনাব জন্যে আমরা, এবং আমাদের চেয়েও বেশি, ফুটপাতের ঐ মানুষগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কবে আছে।

কিন্তু আব নয়। রাস্তার গল্প আর বেশি টানলে আমি নিজেও হয়তো রাস্তা হারিয়ে ফেলব। হাজার হোক, এখনো আমার একটা

ঘর আছে। সেই ঘরখানায় ঢুকলে রাস্তার কথা হয়তো আমিও ভুলে যেতে পারব আপনাদের মতোই।

## ॥ যোগ ॥

সংসারে এমন লোক বোধহয় একজনও নেই গান শুনে যার ভালো লাগে না। কোনো একটি বিশেষ গান হয়তো সকলের ভালো নাও লাগতে পারে, যে গান ভালো লাগে তাও হয়তো সব সময়ে আনন্দ-দায়ক মনে হয় না, কিন্তু নির্বিচারে সমস্ত গানই একজন লোকের সারাজীবন খারাপ লেগেছে এমন ঘটনা 'কোটিতে গুটিক'ও মেলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বাংলা দেশে আধুনিককালে এই সর্বজনপ্রিয় গান জিনিসটির যে রকম দুরবস্থা চলছে তাতে অচিরাৎ হয়তো আমরা গান-বিদ্বেষী হয়ে উঠব। কিংবা তা যদি নাও হই, সে আরো ভয়াবহ অবস্থা। এ গান ভালো লাগতে শুরু করলে ভালোমন্দের ভেদরেখাই যাবে লুপ্ত হয়ে।

আধুনিক গানের মতো এমন অধঃপতিত সংগীতকলা ভূ-ভারতে আর একটিও নেই।

বাংলা দেশ গানের দেশ বলে আমরা বড়াই করি। সত্যিই তো, বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতিকবিতা। বৌদ্ধ গান ও দোহার যুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবির রচনায় এ

ধারা ছিল অব্যাহতভাবে প্রবহমান। কিন্তু বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গানের রাজ্যে নেমে এসেছে এক চরম সংকট। শক্তিমান কবিরা কেউই প্রায় গান রচনায় উৎসাহী নন। সেই সুযোগে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন অকবি এবং কুকবির দল। গানের জন্যে যেসব লিরিক লেখা হয়েছে, কিছুকাল আগে পর্যন্তও তা রবীন্দ্রনাথের ভাবচ্ছায়ায় লুকোচুরি খেলে আত্মদৈন্য গোপন রাখতে পেরেছিল বটে, কিন্তু ইদানীং কয়েক বছর ধরে তার দেউলেপনা অভ্রান্তভাবে প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করছে। এবং এসব ক্ষেত্রে, সব শিল্পকলার বেলাতেই যা ঘটে, অন্তঃসারশূন্যতা যতোই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ততোই চলছে ঝুটো জৌলুশের বিকৃত প্রসাধন। শ্রোতা পাকড়ানোর জন্যে কোনো ফিকিরই আজ আর যেন তার কাছে অনাচরণীয় নয়। বাংলা গান এখন লাফ-ঝাঁপ-হুল্লোরের ঠনকোপনায় হিন্দি গানকেও লজ্জা দিতে পারে অনায়াসে।

বলা বাহুল্য বাংলা গানের সুরকারেরাও এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। যোগ্যের সঙ্গেই মিলন ঘটে যোগ্যের। যেমন গান তার তেমনি সুর, একেবারে সোনায় সোহাগা। শুনে-যে আমরা এখনো গলে জল হয়ে যাইনি, এইটেই আশ্চর্য!

হাল্কা-চটুল ভাষার সঙ্গে কানামাছি খেলা-সুর যখন কসরৎ দেখাতে শুরু করে তখন সত্যি বলতে কি মনে হয় যেন বসে আছি এক সার্কাসের তাঁবুতে। কিন্তু সুরকারের কায়দা আর চালিয়াতি উপলব্ধি করাই নিশ্চয় গান শোনার পরম মোক্ষ নয়। সুরের বিষয়ে প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি সংস্কার থাকে মনে, সেই পূর্বচেতনার বনিয়াদকে প্রবলভাবে বিপর্যস্ত করলে সুরের ইমারৎ মাথা তুলে

দাঁড়াতে পারে না। অথচ আমাদের নবীন সুরকাররা বৈচিত্র্যের নেশায় এমন মারাত্মকভাবে পল্লবগ্রাহী হ'য়ে উঠেছেন যে কার সঙ্গে কী মেশাচ্ছেন এবং কানের উপর তার প্রতিক্রিয়া কী, সে বিষয়ে মনে হয় যেন একেবারেই বেপরোয়া।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এই উৎকট অ-সুরপনার হাতে আর আমরা নাজেহাল হতে রাজি নই। বাংলা গানকে আমরা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

আমি জানি, যে গান এখন গাওয়া হয়, তার সুর ও ভাষা বাঙালী শ্রোতাদের এক বিশেষ অংশে খুবই জনপ্রিয়। এবং এ জনপ্রিয়তা যে বাড়াতেব দিকে তাও আমি নিজের বাড়িতে কান পাতলেই মর্মে মর্মে অনুভব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা সেই-জন্যেই, আমি বলব—এই জনপ্রিয়তা যাতে দাবানলের মতো আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ পুরুষকে গ্রাস না করে তার জন্যে এখনই আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। কচি কচি বাচ্চাদের মুখে পরম ছ্যাবলামোয় ভরা পাকা-পাকা গান শুনলে আমার তো হাত-পা সব হিম হয়ে আসে!

তাছাড়া জনপ্রিয়তা কথাটাও বড় মারাত্মক। কারণ সব রকম 'প্রিয়ত্ব'কেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা জানি, ইতিহাসের এক বিশেষ কার্যকারণে চীনদেশে একদা আফিং এবং সমগোত্রীয় কয়েকটি মাদকদ্রব্য খুবই 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চীনদেশের তদানীন্তন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতারা সেই সর্বনাশা জনপ্রিয়তাকে দীর্ঘস্থায়ী হ'তে দেননি। কাজেই একালের বাংলা গানের যাঁরা

'ধারক ও বাহক' তাঁদেরও ভেবে দেখা দরকার, গানের নামে এই ভাঁড়ামি ও পাকামি অপরিণত বালক ও কিশোরদের পক্ষে কী পরিমাণ ক্ষতিকারক হ'য়ে উঠছে!

অবিশ্যি একথা ঠিক, বাংলা গানের চেয়েও হিন্দি গানের প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী। বাংলা দেশের যে কোনো প্রত্যন্তশায়ী পাড়াগাঁতেও আজকাল হিন্দি ফিল্‌ম্‌-সঙ্গীত শুনে থমকে দাঁড়াতে হয়। হিন্দি ফিল্‌ম্‌ এবং তার গানের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার সবগুলো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই, একথা সত্যি, কিন্তু একটা পথ নিশ্চয়ই খোলা আছে। সেটা হল, ভালো বাংলা ফিল্‌ম্‌ এবং ভালো গান তৈরি করা। এর প্রথমটা ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং সেইজন্যে হিন্দি ছবি আমরা দেখলেও তাকে খারাপ বলে চিনতে পারি এবং সেইভাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু গানের বেলায় সে স্ট্যাণ্ডার্ড আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। বরং ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে, খারাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খারাপতর হওয়ার দিকে। তাই হিন্দি আর বাংলা গান মিলে মিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে আজকাল, হিন্দি আর বাংলা গান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের পরিপূরক।

এদের এই পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা ভাবলে মনে আসে বহুদিন আগে দেখা একটি কার্টুনের কথা। দুজন চলচ্ছক্তিহীন মদ্যপ পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিচে ক্যাপশান—united we stand, divided we fall. এমন ইউনিটি সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশে সুকবির অভাব নেই, শক্তিমান সুরকারও

এখানে কম নয়। কেন তাঁরা এই অর্থহীন খেলোমি আর গোঁজা-মিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না? কেন তাঁরা এমন জিনিস দিচ্ছেন না যা আমাদের অতীত-গৌরবের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে? সে কি শুধু শস্তায় জনপ্রিয়তা লাভের মোহে, না অন্য কিছু?

এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনই দিতে হবে। কেবল মুখের কথায় নয়, কাজের ভিতর দিয়ে। না হলে যেভাবে আমাদের উত্তরপুরুষদের বিচারবোধ ও রুচি প্রতিনিয়ত জখম হয়ে চলেছে তাতে অদূর-ভবিষ্যতেই হয়ত বাংলাদেশে স্থাপিত হবে এক চিন্তাহীন কালা-পাহাড়ের রাজত্ব, নির্বিচারে সমস্ত কিছু সুকুমার বৃত্তি ধ্বংসসাধনের হবে যার পরম বৈশিষ্ট্য

## ॥ সতেরো ॥

পূজো এসে গেছে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কী করে আমি টের পেলাম ব্যাপারটা, তাহলে আমি পাঁজি মিলিয়ে হিসেব দিতে পারব না। কিন্তু আরো একটি অকাট্য প্রমাণ আমার নজরে এসেছে। সেইজন্যেই আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারছি পুজো এসে গেছে।

না, রোদে এখনো সেই কাঁসার রং ধরেনি। (পরশুরামের গল্প দ্রষ্টব্য।) কিংবা বাজারে গিয়ে পটল-আলু-কপির পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তন ঘটেছে বলেও লক্ষ্য করা যায় না। আজকের এই

কোল্ড স্টোরেজের যুগে প্রকৃতির সময়োচিত নিবেদন গ্রহণ ক'রে খুশি থাকতে হয় না—সারা বছরই সকল ঋতুর তরকারি সুলভ।

কিন্তু আমি সে সব লক্ষণ দেখে বলছি না। তার চেয়েও জোরালো প্রমাণ হাতে আছে আমার। অবশ্য সকলেই জানেন, খাদ্য ছাড়াও পুজো, অর্থাৎ শরৎকালের আবির্ভাব অনুভব করার অন্য উপায় আছে। যেমন কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা, কিংবা কাপড় জামা-জুতো ইত্যাদির দোকানে নতুন সাইন বোর্ডের আবির্ভাব। তবে এগুলো নেহাতই বাইরের পরিচয়। এর চেয়েও গভীরতর প্রস্তুতির ভূমিকা তৈরি হতে থাকে অন্যত্র। আমি সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ই উদ্‌ঘাটিত করব আজ আপনাদের কাছে।

লেখা। হ্যাঁ, চমকে উঠবেন না, লেখকেরা যা লেখেন, সেই বস্তুই আমার আলোচ্য বিষয়। পুজোর সময় রংবেরংএর কতো সব শারদীয় সংকলন প্রকাশিত হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? এগুলোর মালমশলা যে মহালয়ার বহু আগে থেকেই সযত্নে সংগৃহীত হ'তে থাকে তা কি অনুমান করেছেন কখনো? হয়তো করেন নি। কিন্তু লজ্জিত বোধ করার নেই তাতে। আমিও অনুমান করিনি। অন্তত মাসখানেক আগেও আমি এ বিষয়ে অচেতন ছিলাম। তারপর এক বিচিত্র কার্যকারণে মোহনিদ্রা ভেঙে গেল আমার। আর এখন, বললে বিশ্বাস করবেন না, জাগ্রত অবস্থাতেই জ্ঞান লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম।

বন্ধুমহলে আমার আড্ডাবাজ বলে খ্যাতি ছিল। আড্ডার প্রাণ হল হাসিঠাট্টা। বন্ধুরা বলত, আমি যাকিছু বলি তাইতেই নাকি

তাদের হাসি পায়। তারপর কালক্রমে এমন সময় উপস্থিত হল যখন রগুড়ে মানুষ বলে আমার সুনাম (?) রটে গেল, এবং যারা কখনো আমার সঙ্গে আড্ডা দেয়নি, তারাও আমাকে দেখে হাসতে লাগল।

আমার কাছে, বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা খুবই শোকাবহ হ'য়ে উঠল। আমি এতে লজ্জিত বোধ করতাম। কিন্তু বন্ধুরা বলত, এই লজ্জার ভাবটা নাকি আমার হাস্যকরতাকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে তোলে। শুনে আমি স্তম্ভিত হতাম।

কিন্তু এসব ছিল ঘরোয়া ব্যাপার। দুঃখ বোধ করলেও ভেঙে পড়বার মতো কিছু নয়। তারপর, হঠাৎ কি দুর্মতি হল, মাসখানেক আগে পাড়ার ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে একটি ছোট্টো মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় লিখে ফেললাম, 'হাসির চেয়ে হেঁচকি ভালো।' ব্যস, সেই হল আমার কাল। তৎক্ষণাৎ দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল, আমি লিখেছি। এবং সভাস্থলের প্রত্যেকে ঐ একটি মাত্র লাইন পড়ে এত বেশি হাসতে লাগল যে সকলেরই প্রায় হেঁচকি ওঠার মতো অবস্থা।

পাড়ায় একটি পত্রিকা ছিল, নেহাতই পাড়াটে ব্যাপার, তার সম্পাদক এসে বলল, 'দাদা আপনাকে লিখতে হবে।'

'কী ? প্রেসক্রিপশান ?'

'অ্যাঁ !' হকচকিয়ে গেল সে।

'যদি মাথার ব্যামো হ'য়ে থাকে তো ডাক্তার দেখাও না। আমার কাছে কেন ?' বলে আমি স্থানত্যাগের উদ্যোগ করলাম।

সে বেচারা, বাড়িয়ে বলছি না, একেবারে বসে পড়ল মাটিতে।

দুঃখে নয়, হাসিতে। বলতে লাগল, 'এই-এইটুকুই দেব তাহলে ছেপে। ওঃ হো হো, কী সাংঘাতিক! বাপ্‌স্‌, একেবারে পাগল বানিয়ে ছাড়লেন। ওঃ হো হো—!'

পালিয়ে বাঁচলাম সেই সুযোগে।

পরদিন সকালবেলায় সবে ঘুম থেমে উঠেছি, কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি সেই ছেলেটি। একগাল হেসে সে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন লেখাটা।'

'তার মানে?' চমকে উঠে বললাম, 'লেখা দেব বলেছি কখন?'

'বলেন নি, কোনো লেখকই বলেন না, আমাদের জোগাড় করে নিতে হয়।'

'আরে আমি যে লেখক, সে কথা বলল কে?'

'ছিলেন না, হতে আপত্তি কী? জানেন, রাজশেখরবাবু লেখা শুরু করেছিলেন চল্লিশে? আর আপনি তো এখনো—।'

'থামো, থামো' চটে উঠে বললাম, 'কার সঙ্গে কার নাম তুলছ! আমি পারব না।'

'বেশ, তবে আমিও বসলাম।'

কাজেই কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে বলতে হল, 'কোনো বড় লেখককে ধরো না? বেশ নাম হবে তাহলে কাগজের।'

তাতো বটেই। কিন্তু কেউ রাজি হচ্ছেন না। অনেক লেখা লিখতে হবে, ওঁদের আর উপায় নেই।'

'বেশ তো। তোমাদের তো দরকার পুজোর সময়। হাতের কাজ শেষ করেই না হয় দেবেন।'

আমার অজ্ঞতায় ছেলেটির বোধহয় করুণা হল। সে বলল,

'দাদা, পূজোর লেখাই তো লিখছেন ওঁরা। পূজো আসতে বাকী আছে নাকি? আর তো মোটে দু মাস!'

'এত আগে থেকে?'

'এরও আগে থেকে!' ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল আসব।'

অবশেষে, পরদিন নয়, পঞ্চমদিনে সারারাত্রি কলম চিবিয়ে একটি লেখা আমাকে তৈরি করে দিতেই হল। লেখার পর সে লেখা আর নিজে পড়িনি। সময় হয়তো ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। প্রাণের দায়ে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘটেছিল বোধহয়, কী লিখেছি নিজেই হয়তো তা বুঝতে পারব না। সম্পাদক ছেলেটি কিন্তু লেখাটা দেখে ঘোষণা করে গেল, এবার পূজোয় সেইটেই হবে তার কাগজের সব থেকে বড় সারপ্রাইজ।

পাঁচদিন ঘুম ছিল না। পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। শুনলাম একটি ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকৃত হলাম। লেখা চান। পাড়ার কাগজ যে-প্রেসে ছাপা হয়, সেখানেই ছাপা হয় এঁদেরও শারদীয়া সংকলন। একটি উপন্যাস আমাকে দিতেই হবে।

'উপন্যাস?' আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি! 'গল্পই লিখিনি কোনো দিন তো উপন্যাস।'

'গল্প না লিখলেও উপন্যাস লেখা যায়।' ভদ্রলোক বললেন, 'বেশি বড় নয়, পাঁচ ফর্মা। দিন পনের পরে এসে নিয়ে যাব।'

'অসম্ভব।' আর্তনাদ করে উঠলাম, 'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না।'

'হবে, হবে,' ভদ্রলোক বললেন, 'দিনে পাঁচ ছ' স্লিপ করে

লিখবেন, দেখবেন তিল কুড়িয়ে তাল হ'য়ে গেছে। আর এই যে, সামান্য কিছু দক্ষিণা।'

জোর করে হাতের মধ্যে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সেই থেকে আমি অশ্রুপাত শুরু করেছি। প্রতিদিন কাঁদতে কাঁদতে হাসির উপন্যাস লিখি।

এবং লিখতে লিখতে হাসি।

## ॥ আঠারো ॥

সকালে কি সন্ধ্যের দিকে, ছুটির দিন হ'লে প্রায় সারাদিনই, একটা অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকাল। একবার সময় করে কলেজ ষ্ট্রীটে কি ভবানীপুরে বা গড়িয়াহাটার মোড়ে যাবেন, দেখতে পাবেন শুধু মানুষ আর মানুষ।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পূজোর বাজার। পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত যাই থাক না কেন আপনার পকেটে, পুজোর বাজার থেকে আপনার অব্যাহতি নেই।

আমার কিন্তু কেনাকাটার জন্যে বাজারে ঘুরে বেড়াতে একটুও ভালো লাগে না। নতুন ডিজাইনের কাপড়-জামা-জুতোর সমাবেশ, সুসজ্জিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনাগোনা, সেল্‌স্‌ম্যানদের কন্যাকর্তা-সুলভ বিনয়, এগুলো আমারও ভালো লাগে বইকি! তবে অজস্র

ভালো জিনিসের ভিড়ের মধ্যে ঠিক কোনটি যে আমার পছন্দ তাকে আবিষ্কার করতে যে আন্দাজ নাজেহাল হতে হয় তাইতেই আমি সংকুচিত হয়ে উঠি।

ধরুন, আমি একখানি শাড়ী কিনব। টাকার হিসেবে মোটামুটি একটা বাজেটও ঠিক করা আছে। দোকানে ঢুকেই আমাকে প্রথমে যে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হবে সেটা হ'ল শাড়ীখানা মিলের, তাঁতের, সিল্কের না নাইলনের। যা হোক, এ সম্ভাবনাটা হয়ত আমার আগেই ভাবা ছিল, কাজেই সম্মতি জানানো গেল তাঁতের সপক্ষে। তখন আমাকে কোণার দিকে জনৈক সেল্‌স্‌ম্যানের হেপাজতে হাজির করা হ'ল। বলা বাহুল্য আমিই তাঁর একমাত্র ক্রেতা নই, আমার আগেও যেমন সেখানে একটি নাতিবৃহৎ ভিড়ের অস্তিত্ব ছিল, আমার পরেও তেমনি সেখানে বেশ কয়েকজন নতুন ক্রেতার সমাগম ঘটতে থাকল। সেল্‌স্‌ম্যান ভদ্রলোক ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো এই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত ক্রেতারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তৎপর হয়ে আছেন। নিপুণ রাঁধুনি যেমন কড়াই-এ ছাড়া প্রত্যেকটি মৎস্য-খণ্ডকেই ভালো করে উল্টে-পাল্টে ভেজে নেন, তেমনি তিনি আমাদের সকলের প্রতিই সমানভাবে মনোযোগ দিচ্ছেন।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, দোকানের উজ্জ্বল নিওনের অস্বাভাবিক আলো এবং মাঝারি ধরণের শাড়ী দেখে ঈষৎ দোমনা হতে না হতেই সেল্‌স্‌ম্যানটির ত্বরিৎ-গতিতে শাড়ীর আঁচল খুলে নিজের অঙ্গে ঝুলিয়ে মনোহর ভঙ্গীতে দাঁড়ানো, ভালো-মন্দের ভেদরেখা গুলিয়ে দেয় অতি সহজেই। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিলেন, ভাঙা নড়বড়ে ছাতাকেও মেলে ধরলে বেশ টই-টুম্বুর

দেখায়। ঠিক সেই রকমই বলা যায় পাঁচ-পাঁচি শাড়ীকেও অপরূপ ভঙ্গীর হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানিতে দেখলে মনোলোভা লাগে। বাস্তবিক পরীক্ষাটা তখন ঠিক শাড়ীর হয় না, হয় ঘরোয়া আলোয় ঘরনীর দেহে সেটি কেমন মানাবে সেই কল্পনা-শক্তির।

তাছাড়া আরো এক বিপদ আছে, সেটা বলা যায় সমস্ত পুরুষ জাতিরই সাধারণ নিয়তি। শাড়ীটির যে বিশেষ রং, পাড়ের কারুকার্য, বা আঁচলের নক্সা আপনার কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হবে, অনিবার্য রকমেই সেটা গৃহ-সীমান্তে এক অপ্রীতিকর মন্তব্যের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে আজকাল প্রায় রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছে, মেয়েদের কাপড় তাঁরা নিজেরা কিনবেন। পুরুষকে যদি নেহাতই থাকতে হয় তবে সে নিতান্ত তল্পি-বাহক হিসেবে।

সত্যি বলতে কী, কেনাকাটার নামে এই বাজার-সরকারী করা আমার আরও খারাপ লাগে।

কয়েক বছর আগে একটি ঘটনা দেখেছিলাম যা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। পূজোর আগে তখন এখনকার মতোই কেনাবেচা শুরু হয়েছে। দোকানে দোকানে দারুণ ভিড়। ওরই একটিতে এককোণে দাঁড়িয়ে সামান্য কিছু কেনাকাটার চেষ্টায় ছিলাম। দোকানে ঢুকলেন একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এবং একজন প্রবীণ ভদ্রলোক।

এঁরা স্বামী-স্ত্রী তা আমি কিছুকালের মধ্যেই অনুভব করতে পেরেছিলাম। তবে কর্তৃত্বের রাশটি ছিল সুনিশ্চিতভাবেই গৃহিণীর হাতে।

ভদ্রমহিলা নানা রঙের খান-পনেরো শাড়ী কাউন্টারের ওপর জমা করালেন একে একে। তারপর শুরু হ'ল তাঁর পছন্দের কাজ। পাড়, জমি আর আঁচল, সমান জাতের হয় না আর কিছুতেই। একটা মেলে তো আরেকটা মেলে না। যার সবগুলোই সমান ভালো তার দামের অঙ্ক আকাশ-ছোঁয়া। এর মধ্যেই বাছাইয়ের কাজ চলছিল কিছু কিছু এবং সন্দেহস্থলে চলছিল স্বামীভদ্রলোকটির সঙ্গে পরামর্শ। নাটকের এই অংশগুলোই ফ্ল্যাশ-লাইটের নীচে ফেলবার মতো। ভদ্রলোকের বয়স হবে প্রায় ষাট, সামনের দিকে চুল উঠে গেছে, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। হয়তো বয়স-কালে ইনি ছিলেন একজন ডাকসাইটে অফিসার, এখন দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। তাঁর গৃহিণী যখন রোল্ড-গোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে তাম্বুল-পুরিত-অধরে এক একবার করে অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিচ্ছিলেন, 'হ্যাঁগা', তখন স্পষ্টতই তিনি চমকে উঠছিলেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসারই সম্মতিসূচক উত্তর দেওয়া ছাড়া তাঁর কিছুই করণীয় ছিল না। আর, শেষপর্বে কিছু টাকা বার করে দেওয়া। ওইকুটুর জন্যে একজন বর্ষীয়ান পদস্থ ব্যক্তিকে দ্বারওয়ানের মতো মোতায়েন থাকতে দেখে আমার করুণাই হচ্ছিল।

আমাকে দেখেও কারো মনে এই রকম অনুকম্পা জাগে তা আমি একটুকুও চাইনে।

কিন্তু, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, চাইলেই সব কাজ থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। তাছাড়া নিতান্ত দরকারী বহু কেনা-কাটাও যে পূজোর নাম করেই ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল গত কয়েক মাস ধরে, তাও মনে রাখতে হয় বইকি! কাজেই একলাই হোক

আর দোকলাই হোক, বাজারে একদিন বেরোতেই হয়।

আর এমনি মহিমা এই পূজোর বাজারের যে বেরোলেই মুখের চেহারা যায় বদলে। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, যাঁকে অন্য সময়ে দেখলে একজন রাগী মাস্টারমশাই ছাড়া কিছুই মনে করা যায় না, পূজোর বাজারের জন্যে বেরোলে তাঁরই মুখে নববিবাহিতের গোপন উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

আমারও নিশ্চয়ই এই রকমই হয়। আর এই সব লক্ষণ দেখেই দোকানদারেরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, এবং আরো কয়েক-জন পায়েপায়ে ঘোরে।

পূজোর বাজার শুধু আমাদেরই নয়, সকলেরই। পূজোর আগে বোনাস আর অগ্রিম মাইনের টাকা পকেটে আসে। দোকানে দোকানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাতিল হয়ে যায়, সারা বছরে যা ব্যবসা হয় তার চতুর্গুণ কর্মব্যস্ততা দেখা দেয় এই কয়টা দিনে। যারা প্রকাশ্যভাবে রোজগার করতে পারে না, তারাও যদি এই সময় ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলে দোষ দেওয়া যায় কী করে? পায়েপায়ে ঘোরে তারাই।

তারপর আপনার-আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে কখন যে ঠিক কি ঘটে যায় ঠাহর করা যায় না, পয়লা দোকানে ঢুকেই কিছু একটার দাম দেবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখা যায় যাকে খুঁজছেন সে ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য!

দুঃখ করার কিছু নেই। ছিল তো কয়েকখানা কারেন্সি নোট! হাতসাফায়ের আণ্ডার-কারেণ্টে এক কূল ভেঙে তা আরেক কূলে ভেসে উঠেছে।

অন্যের বাজারের মাশুল জুগিয়ে পাছে আমাকে বেজার হয়ে ঘরে ফিরতে হয় এই ভয়ে পূজোর আগের কয়েকটা দিন আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। আপনাদেরও মনে যদি এই উদ্বেগের ছিটেফোঁটা পৌঁছোয় আমি খুশী হব।

## ॥ উনিশ ॥

বোধ করি স্বপ্ন দেখছিলাম।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি আমি ক্রিকেটের মাঠে। বিশ্বাস করুন, টিকিটের জন্যে আমি চেষ্টা করিনি। আমি কোনো আড্ডায় যাইনে। ক্রিকেটের কথা আলোচনা করতে না পারলে আমার 'পাঁচ আইনে' ধরা পড়ে কলকাতা শহর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু কী করে টিকিট পেলাম আর মাঠে এসে হাজির হলাম সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এই সব কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার যোগভঙ্গ হল। কে যেন ওপাশ থেকে মন্তব্য করল, লোকটা উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই তিন দিক থেকে কোরাসে অনুরোধ এল, ও দাদা, ও দাদু, 'বসে' পড়ুন! (স-এর উচ্চারণ ইংরেজী এস্-এর মতো!)

তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম। তারপর শীতের সকালে হঠাৎ ঘেমে উঠে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম।—অপরিচিত লোকের মুখে দাদা,

বিশেষত দাদু শুনলে আমার গা কেমন করতে থাকে।

ওদিকে খেলা শুরু হ'য়ে গেল। লোক আসার কিন্তু বিরাম নেই। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, প্যাসেজের মধ্যে তখনো গিজ গিজ করছে মানুষ। কোথায় ঢুকবে, কে জানে।

টেস্ট ম্যাচ। সকালের শিশির ভেজা মাঠে সাবধানে ব্যাটিং চলছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি পাশের এক গলাবন্ধ কোট আব খয়েরী টুপি পরা মোটা ভদ্রলোক ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে পান করতে লাগলেন।

লাল শাড়ী আর নীল সান-গ্লাস পরা এক ভদ্রমহিলা আমাব সামনে দিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেলেন।

ব্যাটসম্যন আউট হ'য়ে গেল। কেমন ক'রে তা দেখতে পেলাম না। আমাব সামনে ছিল তখন লাল শাড়ীর ব্যাকল ওয়াল। বিফল মনে নিজের মান রাখতে আশ-পাশেব লোকের দেখাদেখি চ্যাচাতে শুরু করলাম।

শেষ চ্যাচানোটা ছিল আমার। ওপাশ থেকে আবাব মন্তব্য হল, উজবুক।

বিপদে ফেললে দেখছি। এবাব থেকে বেশ স্মার্ট হ'য়ে খেলা দেখব স্থিব করলাম। কিন্তু লাঞ্চেব রিসেস হওয়া সম্ভাবনায় পিলপিল কবে লোক বেরিয়ে যেতে লাগল সামনে দিয়ে। কিছুই দেখতে পেলাম না।

পাশেব খয়েরী টুপি তখন প্যাড়া আর লাড্ডুর মতো কী যেন সব বার ক'রে খেতে লাগলেন। তারপর আবার চা।

লাল শাড়ী ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেলেন।

ওদিকে খেলা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। সূর্য মধ্যগগনে। রানের গতি ঢিলে। সারা মাঠ কেমন যেন ঝিমিয়ে এল। কোথা থেকে এক টুকরো কমলালেবুর খোলা এসে পড়ল খয়েরী টুপির গায়ে। তিনি সেটাকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিলেন পিছনে। ব্যস, এদিকেও একটা মিনিয়েচার ক্রিকেট আরম্ভ হ'য়ে গেল। এবং সময়োচিত প্রীতি সম্ভাষণ। বেশ উপভোগ করছিলাম। ওদিকে কে যেন আউট হ'য়ে গেল। প্রচণ্ড হৈচৈ, চিৎকার। আমি খেলা দেখতে এসেছি, কাজেই চিৎকারে গলা মেলালাম। নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নামবার পর আড়চোখে চেয়ে দেখি খয়েরী টুপি এবার কমলালেবু খাচ্ছেন। আমারও চ-তেষ্টা পেয়ে গেল।

ইতিমধ্যে লাল শাড়ী আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেলেন।

হঠাৎ একটা হৈ-চৈ। প্যাসেজের মধ্যে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদেরই কারো মাথার ওপর থেকে একটা খালি চায়ের ভাঁড় পড়েছে। দুপক্ষের চাপান উতোরে ওঁদের ঐ কবির লড়াইটা যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় চায়ের ছুটি হ'য়ে গেল। খয়েরী টুপি এবার আবার একটা টিফিনক্যারিয়ার খুলে বসলেন। ইতস্তত লোক চলাচল হ'তে শুরু করল। একজন পদস্থ ব্যক্তি ভারী গলায় কাকে যেন বললেন, না আর ফিরছিনে।

অন্য গলায় উত্তর এল, সে কি, এর পরই তো জমবে!

জমুক। আমার একটা ককটেল পার্টি আছে। নেহাৎ ব্যানার্জী বলল, তাই এলুম।

ব্যানার্জি কে? ও, তোমার সেই জুনিয়ার?

হু, বেশ কিছু খসেছে। ফু—ল্! আই'ম এ টাক্ নাট।

ডোণ্ট বি ক্রুয়েল। হেঃ, হেঃ।

হাঃ হাঃ।

আর শোনা গেল না। বেচারা ব্যানার্জি! কতো আশা নিয়েই না বসে আছে বাড়ীতে, অথচ এদিকে এই ব্যাপাব।

চায়ের সময়টা শেষ হ'য়ে গেল। লোকেরা যে যার জায়গায় ফিরছে।

খয়েরী টুপি দ্রুত হাত চালাচ্ছেন!

লাল শাড়ী ডান দিকে থেকে বাঁ দিকে চলে গেলেন। এবার সঙ্গে আরেকজন তরুণী, নীলবসনা। কানে এল—

লাল বলছেন নীলকে, নীলের সঙ্গে নীল জামা পড়েছিস কেন ভাই! প্যারট ইয়লো পববি। বেশ কনট্রাষ্ট হবে।

নীলের জবাব, আমি ভাবলাম রোদের সময় খোলা মাঠে এইটেই স্ট্রাইকিং হবে। তুই কিন্তু কপালে টিপটা না দিলেই পারতিস।

হোয়াই?

দে মে থিঙ্ক, ইউ আর ম্যাবেড!

হিঃ হিঃ হিঃ

হিঃ হিঃ...

খেলা শুরু হ'য়ে গেছে ওদিকে। সবাই আসন পরিগ্রহ করছে। মাঠে কেমন একটা স্তব্ধতার ভাব। মচ্‌মচ্‌ আওয়াজে চেয়ে দেখি পাশের খয়েরী টুপি খাওয়া-দাওয়ার শেষে এবার দ্রুত গতিতে চকোলেটের প্যাকেট খুলছেন। আকণ্ঠ ভোজনের ফলে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে। হাত দুটি কিন্তু তখনো তাঁর

মুখ-বিবরে মাল চালান করে যাচ্ছে। কেমন গা গুলিয়ে উঠল আমার। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম, রিনিকে বেশ ফলাও করে বলতে হবে। ক্রিকেট খেলা দেখি না বলে সে বছর যা অপমান করেছিল তার শোধ তুলতে হবে। ভুটু চৌধুরীটা খুব ডিঙ নিয়ে গেছে সেবার। আবে বাবা, ভগবান আছেন। আমার সামনে দিয়ে দুজনে খেলা দেখে এসে ডিসকাস করতে শুরু করবি আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাব, এ তো চিরকাল চলতে পারে না। রিনি একবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, ভুটু টিকিট পায়নি। (ভগবান আছেন)! আমি খেলা দেখছি। আর এর বিশদ বিবরণ আমিই জানাব রিনিকে। তারপর (ভগবান আছেন) ভুটুকে যদি ডাউন দিতে না পারি তো .....!

...মা গায়ে নাড়া দিয়ে বললেন, কী বলছিস যা তা।

অ্যাঁ!

অবেলায় এমন করে কেউ ঘুমোয়! চা হ'য়ে গেছে, ওঠ এবার।
—মা চলে গেলেন। আমিও উঠে বসলাম। তারপর আবার বোকার মতো শুয়ে পড়লাম।

সবই স্বপ্ন!

## ॥ কুড়ি ॥

স্বর্গরাজ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন অবিচ্ছেদ্য, আমাদের মর্ত্য-ভূমিতে, বিশেষ করে এই বাংলাদেশে, ইস্কুলীশিক্ষার অনিবার্য সঙ্গী তেমনি প্রাইভেট টিউটার। ইস্কুলগুলিতে পড়াশোনা কতদূর কি হয় সে বিষয়ে আমি আপাতত কোনো মন্তব্য করতে চাইনে, কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের এমন ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং হোমটাস্কের বহর এতোই বেশি যে, সরলমতি বালকবালিকার পক্ষে সেগুলি সামলে ওঠা এক-রকম অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই, হয় অভিভাবক নিজে পড়াবেন অথবা একজন প্রাইভেট টিউটার রাখবেন, এছাড়া কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এবং যেহেতু আজকাল অভিভাবকদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত অতএব প্রাইভেট টিউটারই যে এক ও অদ্বিতীয় কাণ্ডারী, এটুকু বুঝতে ন্যায়শাস্ত্রের শরণ নিতে হয় না।

কাজেই ইনি আছেন। কলকাতা শহরে উনুন ধরানো ধোঁয়ার মত ইনিও কিছুক্ষণ বাড়ির আবহাওয়া রুদ্ধশ্বাস ক'রে রাখেন। এই নিত্য প্রয়োজনায় ক্ষণিকের অতিথির জন্যে অভিভাবক বা ছাত্র কারোরই খুব বেশি ভালোবাসা নেই। যে অসহায়তায় মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে ইনজেকশান দেওয়ার সময়টুকু পার হ'য়ে যায়, সেইভাবেই সকলে পার হন মাষ্টার আসা এবং মাষ্টার থাকার সময়টুকু। মাষ্টার চলে গেলে সকলেই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচেন।

অথচ না হলেও না।

এবং কেবল আজ নয়, বোধকরি চিরকালই। সুদূর অতীতে মহাভারতের কালেও দেখি আচার্য কৃপ এবং দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত হয়েছেন। আধুনিক যুগে আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেও দেখি একই ইতিহাস। তাঁর সেজদাদার কড়া শাসনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক গৃহশিক্ষকের পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বাবধানে কেটে যেত কবির সারাটা দিন, নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। এবং সব থেকে আশ্চর্য, যে ইংরাজী ভাষায় তিনি পরবর্তীকালে ইংরাজ সাহিত্যিকের মতোই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ছেলেবেলায় সেই ইংরাজি শিক্ষার নামেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখা যায়, তাঁর ইংরাজি ভাষায় টিউটার ছিলেন মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র, অঘোরবাবু। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে ভালো ছিল যে, তাহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙ্গালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেই সময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই এবং তাঁহার আরোগ্য লাভকে অনাবশ্যক ত্বরান্বিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

তাছাড়া অঘোরবাবুর আসার সময়ও ছিল একেবারে অনিবার্য

রকম নির্ভুল। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গেল। এমন দিনে মাষ্টারমশায় কিছুতেই আসতে পারবেন না ভেবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অন্য দুজন সহপাঠীর মনের ভিতরটা 'কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত' হ'য়ে উঠল। এদিকে ঘড়ির কাঁটাও দু-চার মিনিট অতিক্রম ক'রে গেল। মনে খুব ভরসা, অথচ 'এখনো বলা যায় না' ধরনের ভাব। অবস্থাটির বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন—

"...রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেমন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈব-দুর্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে অপর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।"

যাই হোক, এবার হাল আমলের কথায় আসি। প্রাইভেট টিউটার এখন যেহেতু 'নেসেসারী ঈভল্' সেইহেতু অনেক বাড়িতেই দেখেছি তাঁদের অভ্যর্থনা দায়সারা গোছের। শিক্ষকের চোখের সামনে না হলেও বেশ শ্রুতিগম্যভাবেই অনেক গৃহিণীকে ব্যাজার কণ্ঠে হাঁক দিতে শোনা যায়—'ওরে খোকনের মাষ্টার এসেছে, এক কাপ চায়ের জল বসিয়ে দে!' কিংবা মাষ্টারমশাইকেই সম্বোধন করে বলতে শোনা যায়, 'কাল খোকনের জন্মদিন। বিকেলে ও পড়তে পারবে না, আপনি বরং তিনটের সময় আসবেন!' এছাড়া,

'আপনি তো কলেজ ষ্ট্রীটে যান, দেখবেন তো এই বইখানা পাওয়া যায় কিনা.' অথবা 'খোকনের আজ জ্বর হ'য়েছে, আপনি বরং বাবলুকেই গোটাকত অঙ্ক কষিয়ে যান,' এ ধরনের অনুরোধও একেবারে দুর্লভ নয়।

তবে মাষ্টারমশাইরাও যে খুব নিরীহ জীব এমন বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। পরীক্ষার আগের কয়েক মাস কোনো কোনো কৃতবিদ্য শিক্ষক সরস্বতী পূজোর পুরুতঠাকুরের মতো তিন-চার বাড়িতেও বিদ্যাদান করে থাকেন। ইস্কুলের মাষ্টার হলে এমনিতেই বাজারদর বেশি হ'য়ে যায়. তার উপর কারো কারো আবার ছাত্র পাশ করানোর ব্যাপারে এমন হাতযশ থাকে যে তাঁরা 'সীজন টাইমে' নাওয়া খাওয়ার সময় পান না। এই রকম একজন অঘটন-ঘটন-পটু শিক্ষকের কাছে জনৈক ফেলকরা ছাত্রের অভিভাবক পরীক্ষার ঠিক আগের মাসটাতে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছিলেন যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এক অশ্রুতপূর্ব শর্তে রক্ষা করতে হয়েছিল। স্থির হয়েছিল এই যে, সকালে বিকেলে বা সন্ধ্যায় মাষ্টারমশাই পড়াতে পারবেন না, তিনি পড়াবেন দুপুরে তাঁর 'অফ পিরিয়ডে'র সময়ে। অবশ্য সে সময়ে ছাত্রকে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে থাকবে ইস্কুলে। তা না পাওয়া যাক, তার টাস্কের খাতাটা পেলেই চলবে। সেটা যেন সে তার বাড়িতে রেখে যায়। বাড়িতে মানে, বাড়ির জানলায়। মাষ্টারমশাই অবিবেচক নন, দুপুরে এসে বাড়ির লোকের শান্তিভঙ্গ করবেন না। বাড়ির জানলায় সুতো দিয়ে বাঁধা খাতাখানি নিয়ে তিনি ঐখানেই দাঁড়িয়ে টাস্কগুলি সংশোধন করে নতুন টাস্ক দিয়ে যাবেন। এবং গুরু-শিষ্যে সাক্ষাৎ না হলেও

এইভাবে চলবে নিরুপদ্রব পঠন-পাঠন।

শুনেছি, এভাবে পড়েও ছাত্রটি সেবার পরীক্ষার্ণব পার হ'তে পেরেছিল।

আরেকজন কলেজের অধ্যাপক জনৈক দ'য়ে মজা ছাত্রের অনুরোধে শুধু এইটুকু সময় দিতে পেবেছিলেন যে, তিনি যখন ভোর-বেলার ফাঁকা ট্রামে বড়বাজারের এক ধনী ছাত্রকে পড়াতে যান সেই সময়টুকু ছাত্রটি তাঁর সঙ্গে একই সীটে বসে জ্ঞানসঞ্চয় করে নিতে পারে। অবশ্য প্রণামীর অঙ্ক যে তাই বলে কিছু কম ধার্য করা হয়েছিল তা নয়। এবং সবটাই ছিল আগাম।

ইনি অবশ্য পরবর্তীকালে এঁর এক নবীন সহকর্মীকে আগাম নেওয়ার কারণটা সবিস্তারেই বলেছিলেন। তাঁর ধারণা, আগাম না নিলে, (১) ছাত্রের দিক থেকে সীরিয়াসনেস আসে না (২) পরীক্ষার মাসের মাইনে পাওয়ার নিরাপত্তা থাকে না, এবং (৩) ছাত্র যদি ফেল করে, কিংবা ঈশ্বর না করুন, মারা যায়, শিক্ষকের পরিশ্রমটাও সেই সঙ্গে মাঠে মারা যায়।

সুখের বিষয়, হাজারকরা একজন গৃহশিক্ষকও হয়তো এই ব্যক্তির মতো দূরদর্শী নন। এবং সেইজন্যেই এখনো বনে না গিয়ে মানুষ সংসারেই বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে অবস্থা এখন চলছে তাকেও ঠিক মনুষ্যোচিত বলা যায় না। গৃহশিক্ষক এবং অভিভাবক এই দুপক্ষই যদি একটু সংযত না হন তবে এই হৃদয়হীন পরিবেশের ভিতর দিয়ে যে সব ছাত্রেরা 'মানুষ' হ'য়ে উঠছে তারা হয়তো সংসারে বাস করেই হ'য়ে উঠবে এক-একটি বনমানুষ।

## ॥ একুশ ॥

সেই লোকটিকে নিয়ে সম্প্রতি কাগজে অনেক রসিকতা করা হ'য়েছে। মধ্য-প্রদেশের সেই বনবিভাগের কর্মচারী—যিনি তিন দিনের ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে দূরবর্তী গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা প্রণামী হিসাবে রোজগার করে চাকরী স্থলে ফিরে এসেছেন। গেরুয়াকে এভাবে বিকল্প রোজগারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করায় অনেকেই আমরা চমৎকৃত, কেউ বা বিরক্ত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই ঘটনার গভীরতর ইঙ্গিত আমরা কেউই ধরতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

ভেবে দেখুন, আমাদের সকলেরই রোজগার করার স্বাধীনতা আছে। চুরিডাকাতী বা জাল-জোচ্চুরী করে উপার্জন করলে সেটা আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত রকম উপার্জনের পথই সাধু। এমন কি 'সাধু' সাজাও। অবশ্য সাধু সেজে কাউকে ধাপ্পা দিয়ে বা ঠকিয়ে রোজগার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সাধুর কাছে স্বেচ্ছায় যে-সব টাকা প্রণামী হিসাবে আসে, সেগুলি গ্রহণ করলে অন্যায় বলা যাবে না। মধ্য প্রদেশের কর্মচারীটিও আইনের এই ফাঁক দিয়েই বেমালুম অব্যাহতি পেয়ে গেছেন। ভালোই হ'য়েছে।

বিকল্প রোজগার বা সাইড ইনকাম না করে এমন লোক সংখ্যায় খুব বেশী নয়। যাঁরা করেন না, বা করতে পারেন না, তাঁরাও খুব

শান্তিতে নেই। বিশেষ করে আজকাল যা বাজার হ'য়েছে তাতে প্রধান রোজগারের ধারায় অন্য কতকগুলি শাখা রোজগার এসে বলসঞ্চয় না করলে সংসার-তরণী যখন তখন চড়ায় আটকে যাবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় সকলেই আমরা এটা-সেটা করে আরো কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টা করি। প্রাইভেট ছাত্র-পড়ানো, দালালী, হোমিওপাথী চিকিৎসা, ছোট ক্লাবের ভাড়াটে হিসাবে ফুটবল খেলা বা অভিনয় করা, রেডিও প্রোগ্রাম পাওয়া, বা সাময়িক পত্রে ফিচার লেখা—সবই সাইড ইনকামের মধ্যে ধর্তব্য। এগুলি যদি দোষণীয় না হয় তবে সন্ন্যাসীর ভেকধারণই বা দোষণীয় কেন? আর্থিক জগতের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হয় ডিমাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের টানাপোড়েনে। পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রণামীর বিনিময়ে পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা যেখানে প্রবল, আসলের সঙ্গে সেখানে অনেক নকল সাধুও যে দেখা দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মধ্য প্রদেশের যে অঞ্চলে আলোচ্য বন-কর্মচারী পসার জাঁকিয়ে বসে ছিলেন, নিশ্চয়ই সেখানে ডিমাণ্ড ছিল। মাত্র তিন দিনে সাত হাজার টাকা রোজগার করাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কাজেই তিনি না গিয়ে অন্য কেউ গেলেও ফল প্রায় একই রকম হত।

অতএব স্বীকার করতে হবে, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে 'ফিল্ড সার্ভে' করে কাজে নেমেছিলেন তিনি তাঁর। এই ক্ষুরধার বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই দোষণীয় দেখা যাচ্ছে না, এবং সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে আমরা যে বিরক্ত, তাও ঐ বুদ্ধিরই জন্যে। সকলেই আমরা ঐ পথে বা অন্য যে-কোন অ-দণ্ডনীয় পথে সহজে বাজিমাৎ করতে চাই। কিন্তু পারি না। তিনি পেরেছেন। আমরা সকলেই তাই অল্পবিস্তর

মর্মাহত, এবং রসিকতার ভিতর দিয়ে সেই মর্মজ্বালাকে সহনীয় করার চেষ্টা করছি।

কিন্তু সত্যি কথা হ'ল এই যে, আমরা হেরে গেছি।

## ॥ বাইশ ॥

'আপ উঠিয়ে,' 'আপ উঠিযে' ব্যাপারটা যতো কৌতুকজনকই হোক, ভদ্রতা জিনিসটা যে একেবারেই উপহাসের বিষয় নয়, আমাদের আচার-আচরণ দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। আতিশয্য সমস্ত ব্যাপারেই বর্জনীয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা যদি বেণীর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও কেটে দিতে চাই তবে সেটা একটু বেশী দেওয়া হবে না কি? অন্তত, ভদ্রতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বাদ দিতে গিয়ে আমাদের ঝোঁকটা যে পড়ে সেইদিকেই তাতে আর দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আমি জানি, বর্তমান নাগরিক জীবন আমাদের সর্বব্যাপারে এমন তটস্থ করে রেখেছে যে, আমরা সকলেই এক-একটি স্নায়ু-বিকারের রোগী হ'য়ে উঠেছি। তবু 'স্নায়ু' জিনিসটার স্বভাবই এই যে, যতো রাশ আলগা করা যায়, ততোই তার বিকার যায় বেড়ে। 'নিউরসিস'কে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রধান উপায় হল, এই বিকারের বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ওঠা।

সচেতন প্রয়াসে আমরা অনেক সময়েই ছোটখাটো 'নিউরসিস'কে

কাটিয়ে উঠতে পারি। এ প্রায় পরীক্ষিত সত্য। বাস্‌-এ বা ট্রামে আমরা কতো সহজে মেজাজ খারাপ করে বসি তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। কনডাকটার ভাড়া চাইল। আপনি একটি সিকি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডালহৌসী'। বাস তখন চৌরঙ্গী দিয়ে ছুটেছে। কনডাকটার আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে উঠেছেন?' বাস, আপনার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল, তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আপনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সামনেই তো উঠলাম, দেখতে পান নি?' সেও পিছু-পা হবে কেন? তৈরী জবাব দিল, 'কি জানি, কতো লোক উঠছে, মনে থাকে না!' ইতিমধ্যেই দু'চারজন যাত্রী এদিকে কৌতূহলী হ'য়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। হয়তো তার মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। কাজেই আপনি কনডাকটারের বাক-বৈভবে ঈষৎ কোণঠাসা এবং অপমানিত বোধ করলেন, চাপা গর্জনে তরপে উঠলেন, 'তা মনে থাকবে কেন? ঈডিয়ট কোথাকার!' ছিটকে তার প্রত্যুত্তর এল, 'মুখ সামলে কথা বলবেন।' বাস্‌-এর সবগুলি মুখ এদিকে ঘুরে গেল। নাটকের ক্লাইম্যাক্স, এবং সামনে আয়না থাকলে সকলে দেখতে পেতেন আপনার মুখখানি ভিলেনের মতো বীভৎস!

এমনি প্রায় সর্বত্র। অথচ এর কোনো মানে হয় না। সামান্য একটু ভদ্রতাবোধের অভাব মানুষকে কী রকম স্বার্থপর করে তোলে তার নমুনা পথে-ঘাটে ছড়ানো দেখতে পাবেন। একটু আগে বাস্‌-এর কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। তখন আপিসের সময় নয়, কিন্তু বাস্‌-এ ভিড় ছিল। লেডীজ সীট সবগুলিই ভর্তি। তুজন তরুণীর সঙ্গে তিন-

চারজন যুবক উঠল। তাদের বয়স সকলেরই কলেজে পড়ার মতো, অন্তত উচ্ছল হাসি ও উচ্চকিত বাক্য-বিনিময়ে মনে হ'ল সহপাঠী-পাঠিনী হওয়া বিচিত্র নয়। তরুণীদ্বয়কে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পাশে-বসা ভদ্রলোকটির নামবার জায়গা এসে গিয়েছিল, তিনি নেমে গেলেন। ঠেলাঠেলি করে মেয়ে দুটির কাছে এগিয়ে এসে যুবকেরা গল্প-গুজব শুরু করে দিল। বাস্ চলতে আরম্ভ করল। কয়েক স্টপ পরে মেয়ে দুটি নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সঙ্গী ছেলেদের মধ্যে দুজন ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ল খালি সীটে। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার হাতে ছিল বেশ বড় আকারের একটি বইয়ের প্যাকেট। চলন্ত বাস্-এ প্যাকেট নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে সীটে-বসা একটি যুবকের মাথার উপর বোধকরি আমার হাতটা লেগে থাকবে, তৎক্ষণাৎ সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মাথার উপর হাত তুলে টেরি সামলাতে সামলাতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'ঠিক করে দাঁড়ান!'

মনে করেছিলাম উত্তর দেব না। কিন্তু তার পাশের সঙ্গীটি টিপ্পনী কাটল, 'দাদার বোধহয় পায়ের ওপর কন্ট্রোল নেই!'

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। ফলে জবাব দিতে হল। বললাম, 'দেখুন, আপনারা যেখানে বসে আছেন সেখানে আমিই বসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে যে মেয়েরা উঠেছিলেন তাঁদেরই জন্যে সীট ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁরা উঠে যেতে আপনারা হুড়মুড় করে বসে পড়লেন, আমার কথা আপনাদের মনে পড়ল না। এখন আবার এইসব বলছেন?'

কিন্তু তারা কেউ লজ্জিত হল না। বরং আমাকেই নির্বোধ

প্রতিপন্ন করে একজন বলল, 'রিজার্ভ সীট নাকি আপনার? ভদ্রতা শেখাতে এসেছেন?'

না, আসিনি, মনে মনে বললাম, ভদ্রতা যার নেই তাকে শেখানো যায় না। এবং যায় না বলেই ভদ্রস্বভাবের মানুষদের আমরা মিন্‌মিনে, ভীরু, বোকা এবং অপদার্থ জ্ঞানে উপহাস করি। কিন্তু সকলেই যদি দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ নিতে উদ্যোগী হতেন তাতেই কি সংসারটা খুব সুখের জায়গা হ'য়ে উঠত!

পরস্পরের প্রতি সৌজন্য, নারীর প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা, বৃদ্ধের প্রতি বিনয় এগুলি অবশ্যই উপহাসের বিষয় নয়—উপহাস যখন করি তখন বুঝতে হবে আমাদের আত্মিক দীনতা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

বিশেষ করে ধিক্কার জাগে যখন দেখি বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উদাসীনতা। সংসারে শিশু যেমন আমাদের অপরিসীম মমতা দাবী করে, বৃদ্ধরাও তেমনি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার অধিকারী। যে জগৎটাকে আমরা আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছি, সেই জগতের যাবতীয় বন্দোবস্তই করে গেছেন আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষের মানুষেরা। আজ তাঁরা অক্ষম, অশক্ত, কিন্তু তাঁরা না থাকলে সংসারটাকে ঠিক যেমনভাবে আমরা পেয়েছি তেমন করে তো পেতাম না! এজন্যে তাঁরা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। তাছাড়া তাঁদের বর্তমান অবস্থা তো আমাদেরও ভবিষ্যতের দিশারী। এজন্যেও মহাকালের দরবারে আমাদের বিনীত হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হই কি? হই না। ট্রামে-বাসে এবং ট্রেনে অজস্র

বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কাতরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যুবক-যুবতীরা আসন ছেড়ে দিয়েছেন এমন ঘটনা বিরল।

যুবকের সঙ্গে 'যুবতী' কথাটা সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি। আমি অনেক বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করেছি, একজন বৃদ্ধ অতিথি এলে গৃহস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু তাঁর তরুণী স্ত্রী পায়ের উপর পা তুলে যেমন সোফায় বসেছিলেন তেমনি বসে থেকেই নমস্কার জানালেন।

নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এটা ঠিক ভদ্রতা নয়। 'লেডীজ ফার্স্ট' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, তা আমি জানি। সেটা পুরুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুরুষেরা আগে মেয়েদের পথ করে দেবেন। কিন্তু মেয়েদেরও নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে, অন্তত বৃদ্ধদের বেলায় তো বটেই। সে কর্তব্য পালন না করলে মেয়ে বা পুরুষ এ সংজ্ঞা বাদ দিয়ে নিছক মানুষ হিসাবেই তো তাঁরা ছোট হয়ে যান।

সত্যি কথা বলতে গেলে বলা যায়, আমাদের জীবনে সৌজন্যের স্থান এত সঙ্কুচিত যে অসৌজন্যকেই আমরা যেন মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। এবং নিজেরাও যেমন সারাজীবন কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সামনে এগোতে চেয়ে হাস্যাস্পদ হচ্ছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অনবরত স্মার্ট হ'তে উপদেশ দিয়ে সেই কনুইবাজির দিকেই লেলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একটু চোখ মেললেই আমরা দেখতে পেতাম, যে-জাত সত্যিই বড় হ'য়ে ওঠে তার প্রতিটি ব্যক্তিরই চরিত্রগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়—ভদ্রতা। এবং ঠিক ঐ সামান্য একটু জায়গাতেই মানুষের সঙ্গে ইতরপ্রাণীর পার্থক্য!

## ॥ তেইশ ॥

চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না, একথা ঠিকই। কিন্তু চালাকীর প্রতিষেধক হিসেবে চালাকীই যে অব্যর্থ ওষুধ তাও একেবারে পরীক্ষিত সত্য। যেমন, প্রণিধান করুন—

গাব্লুদাকে তো চেনেন? আমাদের আড্ডার পরমাশ্চর্য নিউফাইণ্ড গাব্লুদা? তাঁরই সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম সেদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবো ব'লে। গাব্লুদার প্রয়োগনৈপুণ্যে ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল একেবারে অন্যরকম।

রাস্তায় বেরিয়েই গাব্লুদা বললেন, 'একটা ট্যাক্সি দেখা যাক—'

'ট্যাক্সি?' আমি প্রায় চমকে উঠে বললাম, 'সাড়ে চারটে বেজে গেছে, এখন কি আর ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? তার চেয়ে বরং...।'

'না না ভাই, ট্রামে-বাসে নয়। জামাকাপড় একেবারে যাচ্ছে-তাই হ'য়ে যাবে। ঐ দেখ, একটা ট্যাক্সি আসছে।' গাব্লুদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু ট্যাক্সিতে আরোহী ছিল, চলে গেল।

গাব্লুদা বললেন, 'চল একটু এগিয়ে যাই, মোড়ের মাথায় পাওয়া যেতে পারে।'

আমি অপ্রস্তুত হাসি টেনে বললাম, 'গাব্লুদা, বরং তার চেয়ে...।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'এখনো সময় আছে।

একটু দাঁড়াও না, ট্যাক্সি আজ একটা জোগাড় করবই।'

'কী যে বলেন', আমি রসিকতার চেষ্টা করলাম, 'ট্যাক্সি পাওয়া ব্রহ্মলাভের চেয়েও কঠিন সাধনা। যে পায়, সে পায়। যে পায় না, সারাজীবন মাথা খুঁড়লেও তার গতি নেই।'

'বিশ্বাস করিনে। ওসব হল তোমাদের নাকীকান্না। চেষ্টা করলে আবার···ঐ যে একটা—।' গান্নুদা ধাবিত হলেন সেদিকে।

সত্যি বলতে কি, আমার পায়ের জোর কমে আসছিল। ট্যাক্সি দেখে উৎসাহ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ি খালি বটে, কিন্তু মিটার-ফ্ল্যাগটি ডাউন করা। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙে জানাল, 'দেখছেনই তো, এনগেজ্‌ড্‌ আছে।'

গান্নুদা—সে তো দেখছি। কিন্তু লোক কই?

ড্রাইভার নিরুত্তর।

গান্নুদা—কী? যাবেন না?

ড্রাইভার—কোনদিকে যাবেন?

গান্নুদা—ঢাকুরিয়া.

ড্রাইভার—লাইনের এপারে না ওপারে?

গান্নুদা—ওপারে।

ড্রাইভার—(গাড়িতে উঠে বসে, স্টার্ট দিয়ে) না বাবু, এনগেজ্‌ড্‌ আছে। (নিষ্ক্রমণ।)

গান্নুদা নীরব। কিন্তু তাঁর চোখে দেখা দিল এক অস্বাভাবিক জ্যোতি। আমি ঈষৎ ভীত হ'য়ে বললাম—'সাড়ে পাঁচটা বাজে, এখনো চেষ্টা করলে—।'

'না না—! ট্যাক্সিতেই যেতে হবে।'

'কিন্তু গাব্লুদা, দেখছেনই তো অবস্থা। এখন ডিমাণ্ড বেশি, ওরা এসপ্ল্যানেডের দিকে ছাড়া ভাড়া নেবে না।'

'আলবৎ নেবে। কী করে নেওয়াতে হয় দেখাচ্ছি।'

'কিন্তু সময় যে এদিকে আসন্ন। এরপর তো ট্রামে-বাসে গেলে আর পৌঁছানো যাবে না।'

গাব্লুদা ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর স্থিবকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন 'দেখ ভায়া, আমার যে কথা সেই কাজ। বলেছি যখন ট্যাক্সিতে যাব, তখন ট্যাক্সিতেই যাব। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি অন্যভাবে যেতে পার।'

একথার কোনো জবাব হয় না। সত্যিই তো আর একসঙ্গে বেরিয়ে তাঁকে ছেড়ে আমি চলে যেতে পারিনে। কাজেই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আব কোনো গত্যন্তব রইল না আমার।

ওদিকে রাস্তায় খালি ট্যাক্সি বিবল থেকে বিবলতর হ'য়ে এল। হবেই। বোজই এইরকম হয়। এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দূবে থাক, বাড়িতে লেবার-পেন উঠলেও ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। মনে মনে গাব্লুদার নিবুদ্ধিতাকে নিন্দা করতে লাগলাম।

ট্যাক্সি পেলেও কি আর এখন সময় মতো পৌঁছানো যাবে!

'ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি···।'

পাশে চেয়ে দেখি গাব্লুদা নেই, এবং পরক্ষণেই সামনে তাকিয়ে দেখি একেবারে রাস্তাব মাঝখানটিতে একটা দ্রুত-আগত ট্যাক্সির সামনে হাত তুলে তিনি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ধড়াস করে উঠল বুকটা—একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হ'য়ে যাবে নাকি?

না, ট্যাক্সির গতি শ্লথ হল। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ফুটপাতের

কাছাকাছি এনে দাঁড় করালো সেটাকে, তারপর নিঃস্পৃহ গলায় বলল ড্রাইভার—'গাড়ি খারাপ আছে।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার সত্যি ঠাহর ক'রে দেখলাম, মিটারে লাল কাপড় বাঁধা।

গাব্লুদাও বলাবাহুল্য সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন। তিনি দরজা খুলে সোজা ভিতরে গিয়ে বসে বললেন, 'হোক খারাপ, চলুন।··· এস ভায়া।'

আমিও ভেতরে গিয়ে বসলাম। যেতে পারব এ ভরসা অবশ্য ছিল না মনে, কিন্তু নাটকটা এবার কোন দিকে মোড় নেয় সে বিষয়ে কৌতূহল জেগে উঠেছিল। নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'চলুন।' গাব্লুদা তাগাদা দিয়ে বললেন।

'বললাম তো গাড়ি খারাপ।'

'এই তো দিব্যি চালিয়ে আসছিলেন। ঐভাবে চালালেই হবে।'

'তা হয় না স্যার', ড্রাইভার বিজ্ঞের হাসি টেনে বলল, 'প্যাসেঞ্জার নিয়ে খারাপ গাড়ি চালানো রিকস্ (রিস্ক্!)।'

'তাহলে খারাপ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কেন?'

'লাইনে বেরিয়ে ভাড়া খাটতে খাটতে আউট হ'য়ে গেছে। গ্যারেজ যাচ্ছি।'

'কী খারাপ হয়েছে?'

'কেন ঝামেলা করছেন দাদু, ছেড়ে দিন না। ট্যাক্সি এখন মেলাই পাবেন।'

'আপনার কী খারাপ হ'য়েছে বললেন না তো?'

'আপনি কি মিস্ত্রি নাকি যে গাড়ির হ্যানো-ত্যানো সব বুঝবেন?'

'কিঞ্চিৎ জানা আছে।'

ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে গান্নুদার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বলল, 'ব্রেক স্লিপ করছে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি।' বলে গান্নুদা উঠলেন। জামা খুললেন। ড্রাইভারকে দিয়ে যন্ত্রপাতি বার করালেন এবং পা-দানীর রবার সীট পেতে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লেন গাড়িব নিচে। মিনিট পাঁচেক কী খুটখাট কবলেন, বুঝলাম না। তারপর বেরিয়ে এসে রাস্তার কল থেকে হাত-পা ধুয়ে জামা-টামা পবে আবার রেডি হ'য়ে বসলেন।

ড্রাইভার নীরবে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করল। রাত তখন আটটা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কাজেই লেকের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে গান্নুদার বাড়িতে এসে নামলাম।

ভাড়া দিতে গেলাম আমরা, ড্রাইভার নিল না।

ট্যাক্সিটা চলে গেলে গান্নুদা বললেন, 'কী বুঝলে, বল তো?'

'গাড়িটা মেরামত করেছেন ব'লে নিল না।'

'ধুঃ, কিচ্ছু করিনি। জানিই না, তা করব কী? এটা হল ওর আক্কেল-সেলামী। হাঃ হা' হা, আমার কাছে চালাকী।...চল চা খেয়ে যাবে।'

সত্যি বলছি, শুধু ড্রাইভারই নয় আমিও থ' বনে গেলাম গান্নুদার এই মোক্ষম প্যাঁচের চালাকী দেখে।

## ॥ চব্বিশ ॥

জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার শিশুরা। কারণ এরাই বড় হ'য়ে উঠে তাদের মাতৃ-ভূমিকে নতুন গৌরবের অধিকারী করে। কিন্তু আমাদেব দেশে এই ভবিষ্যৎ নাগবিকদেব প্রথম থেকেই যে-রকম অগ্নিপরীক্ষাব সম্মুখীন হ'তে হয় তাতে আশঙ্কা জাগে যে, আমাদের জাতীয উন্নতিব সমস্ত ইমারতটাই হয়তো একদিন ধ্বংসস্তূপে পবিণত হবে।

সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, শিক্ষাই হল জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু একটি শিশুকে শিক্ষিত করে তোলার পথে কী প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক! কলকাতার মতো শহরে যেখানে কেবল বাংলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত, সেখানে নতুন শিক্ষার্থী এইসব শিশুদেব নিয়ে ইস্কুল সীজনের শুরুতে প্রায় প্রত্যেক অভিভাবককেই কী ভাবে নাজেহাল হ'তে হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

প্রত্যেক ইস্কুলেই নতুন ছাত্রকে ভর্তি করাব জন্যে অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যবস্থা আছে। একেবারে প্রাথমিক শ্রেণীর এই ধরণের টেস্টে মা এবং বাবার হাত ধরে পাঁচ ছ' বছর বয়সের বিস্মিত, হতবাক্ মানবশিশুরা ইস্কুল নামক নতুন একটি জায়গায় গিয়ে যে-রকম কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাতে শিক্ষার নামে তাদের মনে

যদি আতঙ্ক ও আক্রোশ জন্মে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

অ্যাডমিশন টেস্টের বিষয়ে কয়েকটি কথোপকথন শোনার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আমার হ'য়েছিল। তা থেকে অবস্থাটির মর্মচিত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা।

এক নম্বর দৃশ্যের ঘটনাস্থল কোনো বহুল বিজ্ঞাপিত ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের আপিস সংলগ্ন বারান্দা। অপেক্ষমান নারী-পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা শ দুয়েক।

একজন মহিলা। (পার্শ্ববর্তিনীকে) আপনার হ'য়ে যাবে। মিস্টার সেন যখন বলে দিয়েছেন—।

দ্বিতীয় মহিলা। (উদ্বেগের সঙ্গে) না ভাই, মিস্টার সেন শুনলাম সেক্রেটারীর অপোনেন্ট পার্টির লোক। কী যে হয়!

১ম মহিলা। হ'য়ে যাবে। আপনার ছেলে তো বুদ্ধিমান! আমার আবার হ'য়েছে কি জানেন, পরীক্ষার ঠিক আগেই ওর আবার জ্বর হল কিনা!

২য় মহিলা। (কাষ্ঠ হাসি হেসে, ঈষৎ অবিশ্বাসের সুরে) বাচ্চারা এক-আধটু গা গরম হলে কেয়ার করে না। কিন্তু আমার যা অবস্থা হ'য়েছিল! টেস্টের এক মাস আগে থেকে বাড়ীতে এক গাদা গেস্ট এল। ছেলেটাকে পড়াতেই বসাতে পারলুম না।

১ম মহিলা। (কাষ্ঠ হাসি হেসে, সমান অবিশ্বাসের সুরে) আগে যা পড়েছে তাতেই হবে। ঐ বোধহয় রেজাল্ট বেরোল……। (সবেগে ধাবিত)

দ্বিতীয় দৃশ্য মোটর গাড়ীতে। স্বামী ড্রাইভ করছেন, ছেলে

কোলে করে স্ত্রী পাশে বসে।

স্বামী। মিছিমিছি অফিস নষ্ট হল। (ক্ষণিক বিরতি) আমার মনে হয় খোকনের বদলে তোমারই আবার ভর্তি হওয়া উচিত।

স্ত্রী। (অন্যমনস্কভাবে) অ্যাঁ—

স্বামী। তা নয়তো কি। এক বছর ধরে তো পড়াচ্ছো। শিখলটা কী?

স্ত্রী। (অপমান হজম ক'রে, কৈফিয়তের সুরে) একশ সাতাশী জনের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটা নিল। আমি কি করব?

স্বামী। (নাক দিয়ে হুঁঃ করে শব্দসহ) তোমার ছেলেটির উনপঞ্চাশ না পঞ্চাশ হ'তে বাধা ছিল কোথায়? যত্তো সব লেম এক্সকিউজ! (সাজোরে গাড়ীর গীয়ার পরিবর্তন) আগেই জানতাম।

স্ত্রী। (তিক্ত বিদ্রূপে) জানতেই যদি তো বসে ছিলে কেন? নিজে পড়ালেই পারতে। কার কতদূর দৌড় আমার জানে আছে।

স্বামী। বাজে ব'কো না বোকার মতো। (ক্ষণেক বিরতি) বালীগঞ্জের ইস্কুলটার রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে?

স্ত্রী। পরশু।

স্বামী। খিদিরপুরের?

স্ত্রী। পনেরই।

স্বামী। কাল কি পার্ক স্ট্রীটের ইস্কুলটার টেস্ট দেওয়াতে যাবে?

স্ত্রী। উপায় কি? এগুলো যদি না হয়?

স্বামী। (নিঃশ্বাস ফেলে) আর পারা যায় না বাপু। নিজের চাকরীর জন্যে এতো উমেদারী করিনি।

স্ত্রী। (তিক্ত হাসির সঙ্গে) তুমি তো আই এ এস পরীক্ষা

দাওনি। খোকনের পরীক্ষা তার চেয়েও কঠিন!

খোকন। (নীরবতা ভঙ্গ করে) আমি আর পরীক্ষা দেব না মা।

স্বামী স্ত্রী। (সমস্বরে) ছিঃ ও কথা বলে না বাবা।

খোকন। রোজ রোজ পরীক্ষা দিতে ভালো লাগে না।

স্বামী স্ত্রী। (সমস্বরে) এইবার ঠিক হ'য়ে যাবে।

খোকন। কিচ্ছু হবে না, আমি জানি সব ইস্কুল বাজে!

তৃতীয় দৃশ্য উন্মোচিত হয় একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইস্কুলের রেক্টারের ঘরে। বাংলার একজন যশস্বী সাহিত্যিক সামনের চেয়ারে বসে আছেন।

সাহিত্যিক। (ইংরাজীতে) মহাশয়, আমার ছেলের ব্যাপারটা একটু পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন?

রেক্টার। (বাংলাতে) আমার অন্তরে খুব দুঃখ হয় একথা বলিতে মিস্টার দস্তিদার, কিন্তু আমি অপারগ। আপনার পুত্র হতাশভাবে অকৃতকার্য হয়েছে।

সাহিত্যিক। আচ্ছা, ক্লাস টু-তে না হোক, ক্লাস ওয়ানে তো নিতে পারেন।

রেক্টার। খুবই সন্দেহজনক। সে তো ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই।

সাহিত্যিক। কিন্তু ক্লাস টুয়ের পরীক্ষায় যে কিছু নম্বরও পেয়েছে সে কি ক্লাস ওয়ানে পারবে না মনে করেন?

রেক্টার। (সহাস্যে) কে বলিতে পারে? কোনো পরীক্ষাতেই তো পশ্চাৎ দিকের ফল ঘোষণা করে না। আপনি বারান্তরে চেষ্টা

করিবেন।

সাহিত্যিক। (উঠে দাঁড়িয়ে) একটা বছর নষ্ট হ'ল আর কি।

রেক্টার। খুবই দুঃখের কথা। (বেয়ারাকে) মিসেস তফাদার—।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। একই নাটকের পুনরাবৃত্তি প্রায় সর্বত্র। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ফলে তার ট্র্যাজিক পরিণতিটা কিছু তীব্রতর হ'য়ে ওঠে, এই যা পার্থক্য। কোনো কোনো অভিভাবিকা ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরে শেষে চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে নিজের মরণ কামনা করেন। কোনো কোনো অভিভাবক ইস্কুলের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষকে জোচ্চোর ঘুষখোর বলে গালাগাল দিয়ে মামলা করবেন বলে শাসিয়ে যান।

কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত ঘটে না। দিন যেমন কাটছিল তেমনি কাটে। ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে। ইস্কুলের সংখ্যা যেমন ছিল প্রায় তেমনি থাকে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে। ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে পরের বছর আবার অভিভাবক আর ইস্কুল-কর্তৃপক্ষের মধ্যে দড়ি-টানাটানি খেলা।

জাতি গঠনের জন্যে চারিদিকে অনেক কিছুই হচ্ছে আজকাল। কিন্তু যাদের নিয়ে একটা জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তাদেরই যে কাভাবে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা ভাবলে সব-কিছুই কেমন বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে।

এই শিশুদ্বেষী শিক্ষা-ব্যবস্থা কবে যে সাবালক হবে কে জানে!

## ॥ পঁচিশ ॥

আজকাল সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলেই আমি ভয় পাই। না, পাওনাদার বা ভোটপ্রার্থী নয়। তাঁরাও আসেন মাঝে মাঝে। কিন্তু তাঁদের দেখলে চেনা যায়। এরা একেবারে অন্যজাতের আগন্তুক। অত্যন্ত হাসিখুশি, নিষ্পাপ চেহারা। দল বেঁধে ছ'সাত জনে আসে একসঙ্গে, এবং এসেই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। যেন চক্রব্যূহে বাঁধা পড়েছি। লড়াই করা তখন অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রাণের বদলে দিতে হয় পণ—অর্থাৎ, মুক্তিপণ। দিনের মধ্যে এ-রকম চার-পাঁচবার। ক্রমাগত এই ভাবে অভিমন্যুর লড়াই চালাতে চালাতে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছি। কড়া-নাড়ার ক্ষীণতম শব্দেই তাই বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে।

বুঝতেই পারছেন, আমি সরস্বতী পূজোর চাঁদা-আদায়কারীদের কথা বলছি। আমাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যে এদের যতো উৎসাহ তার একটা সামান্য ভগ্নাংশও যদি মা-সরস্বতীর কাছে বিদ্যা-আদায়ের জন্যে নিয়োজিত হত, আমি হলপ করে বলতে পারি তাহলে এরা সকলেই এক এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে উঠত। কিন্তু Nature abhors vacuum, সরস্বতীর শূন্য পীঠভূমিতে অনায়াসেই স্থান ক'রে নিয়েছেন দুষ্ট সরস্বতী। দুষ্টবুদ্ধিতে এই সব কিশোরবাহিনী তাক লাগিয়ে দিতে পারে তাদের পিতৃপুরুষকেও।

কলকাতা বিরাট শহর। পাশের বাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত মানুষ থাকলেও পাড়ার লোক তার খোঁজখবর রাখতে চায় না। এ-সবই আমার জানা কথা। তবু অহংবোধটা ভারি মজার জিনিস। সব জেনে-বুঝেও মাঝে মাঝে অবুঝ হ'য়ে যেতে হয়। কড়া-নাড়ার শব্দে সেদিনও যথারীতি হাতের মুঠোয় একটি আধুলি নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। যা আশঙ্কা করেছিলাম তা ঠিকই। চাঁদা-প্রার্থী। বয়স এদের ঈষৎ বেশী, আঠার-উনিশ হবে। একজন সবিনয়ে নিবেদন করল—'আমাদের ক্লাবের চাঁদাটা—!'

'কোন ক্লাব ?'

'চলদগতি সংঘ।'

ঠোক্কর খেল'ম যেন। প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'চলদ্‌গতি সংঘ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', ছেলেটি একটু হাসি টেনে বলল, 'আগে নাম ছিল অগ্রগতি সংঘ। কিন্তু পাশের গলিতে ঐ নামে আরেকটি ক্লাব খুলে বসেছে ওরা। আমরা তাই নাম পাল্টে চলদ্‌গতি রেখেছি।'

অন্য একটি ছেলে ব্যাখ্যার সুরে যোগ দিল, 'এর মাঝে এক বছর আমরা নাম রেখেছিলাম চরৈবেতি সংঘ। কিন্তু ওরা ঠাট্টা করত চড়ুইভাতি সংঘ বলে। তাই আমাদের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর অতনু হাজরা এই নাম রেখে দিয়েছেন আমাদের ক্লাবের।'

'ডাক্তারবাবু ক্লাবের কথা ভাববার সময় পান ?' একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করে বসলাম।

'আজ্ঞে না', ছেলেটি আবার বলল, 'তিনি সে ডাক্তার নন, ডি-ফিল। সত্যেন দত্ত আর রবীন্দ্রনাথ—কার কবিতায় কতোবার সাঁতার কাটার উল্লেখ আছে, সেই বিষয়ে গবেষণা করে—।'

'বেশ বেশ।' আমি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করার জন্য আধুলিটি এবার তার হাতের দিকে এগিয়ে বললাম, 'এই নাও।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে গিয়ে সে চাপা আর্তনাদ করল, 'সেকি স্যার? মাত্র আট আনা?'

বক্তৃতাটা আমার মুখস্থই ছিল। বলতে শুরু করলাম, 'যে দিনকাল পড়েছে, বুঝতেই তো পারছ। তারপর মাসের শেষ। আট আনা করে দিতে দিতেই—!'

সে বাধা দিয়ে অমায়িকভাবে হেসে বলল, 'সে তো ঠিকই। কিন্তু আপনার মতো লোকের কাছ থেকে, বিশেষ করে সরস্বতী পূজোর ব্যাপারে—!'

মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। 'আপনার মতো লোক' এবং 'সরস্বতী পূজো' এই দুটো কথা খুব অর্থবোধক হ'য়ে উঠল আমার কাছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এরা আমার সাহিত্যিক সত্তার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এবং সাহিত্যিক হিসাবে সরস্বতী পূজো উপলক্ষে আমার যে কিছু বেশী দেওয়া উচিত সেই কথাই বলতে চাইছে।•• তা বলতে পারে বৈকি। আমার মতো সাহিত্যিক, বিশেষ করে এই সব অপোগণ্ড যুবকও যখন আমার নাম জানে। মনে মনে বিলক্ষণ লজ্জিত হ'য়ে তাদের দাঁড়াতে বলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, এবং উৎসাহের প্রাবল্যে কড়কড়ে একখানি দু'টাকার নোট সংসার খরচ থেকে হাত সাফাই করে এনে তাদের একজনের হাতে সম্প্রদান করলাম।

টাকাটা নিয়ে সযত্নে পকেটে রেখে ছেলেটি এবার চাঁদার খাতা বের করল। তারপর চাঁদার অঙ্ক, তারিখ-টারিখের সব ঘর ভরাট

করে অমায়িক ভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা—?'

'এ্যাঁ!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

মনে হল বলি 'তোমার মুণ্ড', কিন্তু তাতো আর সত্যিই বলা যায় না, যে দু'টাকার নোটখানা হাতছাড়া হ'য়ে গেছে তাও থাবা দিয়ে ওর পকেট থেকে তুলে নেওয়া যায় না, শুধু নিজের অসীম মূর্খতাকে নিজেই মনে মনে ধিক্কার দিয়ে চাপা গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করে দরজা থেকে ফিরে এলাম।

এমন ঠকা জীবনে খুব কমই ঠকেছি।

✓এক বন্ধুর বাড়ীতে সেদিন এই গল্প বললাম। বন্ধু-পত্নী হেসে বললেন, 'এ তো বড় ছেলেদের কথা। ছোটগুলোও কম যায় না। সেদিন রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছি. এক দঙ্গল এসে বলল, মাসীমা চাঁদা দিন। বাজারের ফিরাত পয়সা পাশেই পড়েছিল, তাই থেকে চার আনা তুলে দিতে গেছি, তা নেবে না। পুরো একটা টাকা চাই। আমি যতো বলি, নেই, ওদের যেন ততোই জেদ বেড়ে যায়—দিন মাসীমা, ও মাসীমা।দিন না। তাই দেখে ওদের মধ্যে একটা বলল কি জানেন? সঙ্গীটাকে মিছিমিছি ধমক দিয়ে বলল, মাসীমা মাসীমা করছিস কেন? দেখছিস কতো সুন্দর, বৌদি বল, তাহলে দেবে। তাই না বৌদি!···বলুন তো কাণ্ড!'

বন্ধুবর স্বগতোক্তি করল, 'কাণ্ড আর কি? একটা টাকাই যে ওরা পেয়েছে. সে তো ঠিকই?'

'মোটেই না। আহা কি কথার ছিরি,' বন্ধু-পত্নী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আট আনার বেশী এক পয়সাও দিইনি।'

'ওই একই কথা হল। চার আনা তো নয়!'

তিনজনেই এবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

এরপর বন্ধু বললেন তাঁর কাহিনী। তিনি তাঁর পাড়ার এক পাঠাগারের সভাপতি। সেখানে সরস্বতী পুজোও হয়ে থাকে প্রতি বছর। চাঁদা ওঠে একশ কি সোয়া শ' টাকা। এবার উঠেছে সাত শ'। অথচ এর জন্যে চেষ্টাও করতে হয়নি কিছু। প্রায় আপনা থেকেই এসে গেছে টাকাটা। ওদের নির্বাচনী কেন্দ্রের এক বিখ্যাত ব্যক্তির ভাই সেদিন কথায় কথায় পাঠাগারটির দুরবস্থার কথা তুলে চাঁদা দিলেন একশ টাকা। ব্যস, পরদিন সকালেই অন্য একজন ততোধিক বিখ্যাত ব্যক্তির কাকা এসে দিলেন দেড়শ। তারপর দুদিনের মধ্যেই অনেক জ্যাঠা, মামা, পিসের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। ফলে ফাণ্ডের এখন টইটম্বুর অবস্থা।

বন্ধু একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই একটা নোটিশ দেব ভাবছি।'

'কিসের নোটিশ?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বসলাম।

'লিখব,' বন্ধুবর নিমীলিত চক্ষে বলল, 'চাঁদা দিতে চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।'

পুনরায় তিনজনে উচ্চহাস্য।

## ॥ ছাব্বিশ ॥

হুজুগ বড় মজার জিনিস। আপন বেগেই আপনি বাড়ে।

অষ্টগ্রহের সমাবেশে মস্ত একটা তোলপাড় হবে, সকলেরই মুখে এই এক কথা। কাগজপত্রেও এই নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা চলছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের মানুষ। এসব অ-বৈজ্ঞানিক কথায় সায় দিতে লজ্জা পাই। তবু মনের মধ্যে যে গেঁয়ো মানুষটা রয়েছে তার কিন্তু পক্ষপাত রয়েছে ঐদিকেই। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে বেশ উচ্চাঙ্গ ধরনের একটা হাসি টেনে সকলেই আমারা আলোচনা করছি এ বিষয়ে। এবং আলোচনা যতো বাড়ছে, আর শেষের সেই দিনটি যতো কাছে এগিয়ে আসছে ততোই আলোচনার মধ্যে একটু একটু করে অস্বস্তি দেখা দিচ্ছে। সকলেরই ভাবখানা এই— কিছুই হবে না জানি, কিন্তু বলা তো যায় না। ভবিষ্যৎ চিরকালই ভবিষ্যৎ, অতএব—!

অতএব, গোপনে একটু শান্তিস্বস্ত্যয়ন, এবং পরিচিত লোক দেখলে পাকে-প্রকারে, যেন নেহাত কথার কথা বলছি এমন ঔদাসীন্যের সঙ্গে ঐ অষ্টগ্রহের কথা তোলা। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, অন্যের মনের ভাবখানা জেনে নেওয়া, এবং সেই সূত্রে যদি নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায়—এই আর কি!

হুজুগ এইভাবেই মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

প্রায় একশ বছর আগে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় মহামতি কালী-প্রসন্ন সিংহ সাধারণ বাঙালীব সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন সেটা এখনো দেখা যাচ্ছে আমাদের বিবয়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। তিনি লিখেছিলেন—

'সাধারণে কথায় বলেন, 'হুনবেচীন' ও 'হুজ্জুতে বাঙ্গাল', কিন্তু হুতোম বলেন, 'হুজুকে কলকেতা।' হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুব! কোনো কাজকর্ম না থাকলে 'জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা' দিতে হয, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে······নিষ্কর্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যতদিন বাঙালীর বেটার অকুপেশান না হচ্ছে, যতদিন সামাজিক নিযম ও বাঙালীর গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্মেশান না হচ্চে ততদিন এই মহান দোষেব মূলোচ্ছেদের উপায় নাই।'···

এটা ঠিকই, আজ আমাদেব হুঁকো হাতে করে সময় কাটানোর দিন নেই, প্রাণ বাখতেই আজ প্রাণান্ত, কিন্তু 'হুঁজুকে কলকেতা'র স্বভাবটা রয়েছে প্রায় একই রকম। এর কারণ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হয় না। আমাদেব জাতীয় চরিত্রেব মধ্যেই বয়েছে সেই কারণটা। আমরা অত্যন্ত বেশী আবেগপ্রবণ, যুক্তির চেয়ে মেনে নেওয়ার দিকেই ঝোক আমাদের বেশী। ফলে, শুকনো খড়ে আগুনের মতো কোনো একটা ব্যাপাব আমাদের মনের মধ্যে এসে পড়লেই আমবা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আমল থেকে যুক্তিবাদেব দিকে বারে বারে আমাদের চরিত্রের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা তাই ব্যর্থ হ'য়েছে।

যাই হোক, আমাদের যেসব বন্ধুরা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পৃথিবী ধ্বংস হবে মনে করে উত্তেজনার সঙ্গে কালাতিপাত করছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে একটা কাহিনী উদ্ধৃত করছি ঐ 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' থেকেই। একশ বছর আগেও অনুরূপ একটা হুজুগের বান এসেছিল কলকাতায়, এবং বলাবাহুল্য তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কাহিনীটা এইরকম—

'প্রলয় গর্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিল-জফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বললে যে, 'আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে, ১৫ই কার্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে।'... আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক হ'য়ে রইলেম! এদিকে শহরেও ক্রমে গোল উঠলো--'১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে!' বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন--একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে শহরের ছোট ছোট বিধবা-দের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভাবটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেমে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হ'য়ে পড়লো।

'শহরের যেখানে যাই, সেইখানেই মড়া ফেরবার মিছে হুজুক। আশা, নির্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন; জোচ্চোর ও বদমাইশেরা সময় পেয়ে গোছালো গোছালো জায়গায় মড়া ফেরা সেজে যেতে লাগল, অনেক গেরোস্তোর ধর্ম নষ্ট হল—অনেকের টাকা ও গহনা গেল—বাজারে হুজুক মাগ্‌গি হ'য়ে উঠ্‌লো। ক্রমে

আষাঢ়াস্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ই কার্তিক নবাবী চালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধি-পূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্যে পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তারের জন্যে মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটির দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র-ভ্রাতাহীন নির্বোধ পরিবারেরা সেইরকম ১৫ই কার্তিকের অপেক্ষা করে ছিলেন। ১৫ই কার্তিক দিল্লীর লাড্ডু হ'য়ে পড়লো—যাঁরা পূর্বে বিশ্বাস করেননি, ১৫ই কার্তিকের আড়ম্বর এবং অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন।···

'১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, রাত্তির দশটা বাজে, মড়া ফিরলো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মতো হ'য়ে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এলাম; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গেল।'

···ঠিক এইভাবে একদিন ফেব্রুয়ারীর ৫ই আসবে, ৯ই-ও পার হবে। এবং জীবন যেমন চলছে তেমনি চলবে। তবে হ্যাঁ, উত্তেজনা চাই বইকি! অষ্টগ্রহের ঝাঝ কমে গেলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলা আছে, তারপর আছে ইলেকশান। তাছাড়া পশ্চিম ইরিয়ান, কঙ্গো—এসব তো স্টকে আছেই। একটা নিয়ে মেতে উঠলেই হল!

হুজুগের প্রতিভা নিত্য নব-নবোন্মেষশালিনী।

## ॥ সাতাশ ॥

ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কথাই আবার বলছি।

আজ রবিবার। এমন পর্যন্তও মারাত্মক কিছু ঘটেছে বলে জানিনে। সূর্য যথারীতি পূর্বাকাশে উদিত হ'য়েছেন, সকালে ঘুম ভেঙে নিত্যকার মতো আজও জমাদারের কর্মদক্ষতার বিষয়ে গৃহ-পরিচারকের উচ্চকণ্ঠ সমালোচনা শুনতে পেয়েছি, এবং নিয়ম-মতো বাজারের থলি-হাতে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি শরীর-পোষণের উপাদান সংগ্রহের জন্যে আমাকে ধাবিত হ'তে হ'য়েছে। অন্যদিনের সঙ্গে আজকের কোনো পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। জীবন সেই একই চালে চলতে শুরু করল আজও। এত বড় একটা সুযোগ মাঠে মারা গেল।

সত্যিই বলছি, আমি হতাশ হ'য়েছি। একেবারে মহাপ্রলয় না হোক, ছোটখাট একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটলে কারই বা এমন কি অসুবিধে ঘটত?

সব থেকে বড় দুর্ঘটনা হল প্রাণহানি। তা কি এমনিতেই আর ঘটছে না? অ্যাকসিডেণ্ট তো জীবনে লেগেই আছে। তা-ছাড়া চাল-ডাল-ওষুধের সমস্যায় পড়ে কতো লোকের প্রাণ রাখতেই যে প্রাণান্ত হ'চ্ছে তাও তো চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি। এমতাবস্থায়

বিপদগুলো একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে যদি একসঙ্গে তুলে ধরা হতো, তাতে কার কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো জানিনে। এই অত্যন্ত অগোছালোভাবে ম্লান হ'য়ে নিভে যাওয়ার চেয়ে বেশ একটা লাগ-ডাঁট হুহুঙ্কারের সঙ্গে যদি দুর্ঘটনা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, মৃত্যুর মধ্যেও তাহলে হয়ত মহত্ব থাকত। কিন্তু কিচ্ছুই ঘটল না সে রকম। আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া এবং বাকীটা বলতে হাই উঠছে!

আয়োজনের মধ্যে কিন্তু কোনো ফাঁক ছিল না।

মধ্য-ইউরোপে তুষার-ঝড়, আমেরিকায় হিমাঙ্কের ১২ ডিগ্রী নিচে উত্তাপ নেমে যাওয়া, আলজিরিয়া এবং মিশরে প্রভঞ্জনের তাণ্ডব, এইভাবে আসরটা জমে উঠছিল বেশ। কিন্তু ঢোলক-ক্ল্যারিওনেট সবই বাজল, দ্রৌপদীও আর্তকণ্ঠে 'প্রাণনাথ' বলে ডাক ছাড়ল, অথচ ঠিক যে-মুহূর্তে গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ করার কথা, তখনি সব চুপচাপ। এ 'টেম্পো' কি আর বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায়? সবই যে বরবাদ হ'য়ে গেল!

অথচ আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। ভেবেছিলাম, পার্কে পার্কে যেমন স্তোত্রপাঠ আর যজ্ঞ চলছে তা চলতেই থাকবে। আপিস-আদালতে লোক কম পড়তে পড়তে একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যাবে। ট্রেনের কামরাগুলো ফাঁকা হ'তে হ'তে ট্রেন চলাই শেষে বন্ধ হ'যে যাবে। বাজারে মাল আসবে না, কয়লার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে, কল থেকে জল পড়বে না, ঘরে আলো জ্বলবে না, এবং তখন অন্য কিছু ঘটুক আর না ঘটুক আপনা থেকেই শুরু হবে যদুবংশ ধ্বংসের মতো এক আত্মঘাতী মহাসংঘর্ষ।

অথবা, আমি ভেবেছিলাম, এ সব কিছু না ঘটলেও কলকাতার সমস্ত লোক হাজির হবে গড়ের মাঠে। চালা তুলবে, তাঁবু খাটাবে—দিব্যি একটা হরিহরছত্রের মেলা ব'সে যাবে। আমরা সব স্বেচ্ছা-সেবক হ'য়ে সেখানে টহল দেব। আরো অনেকে যাবে, যারা ঠিক স্বেচ্ছাসেবক নয়, স্বয়ংসেবক। তারা সেবা করতে চাইবে নিজেদের। আমরা তাদের হাতে নাতে ধ'রে গৃহস্থ ও গৃহকন্যাদের বাহবা অর্জন করব। তারপর এখানে-সেখানে লিখে দেব 'সাবধান! জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

এদিকে লোক-সমাগমের ফলে রীতিমত দোকানপাট বসবে চারপাশে। সকলেরই মনে মৃত্যুভয়, কে বাঁচে কে মরে স্থিরতা নেই। দোকানের গায়ে লেখা থাকবে 'হরি হে তুমিই ভরসা।' এবং ঠিক তার নিচেই 'আজ নগদ, কাল ধার।'

নামাবলী-ধারী জ্যোতিষী এবং বেটনধারী পুলিশের কাজ বেড়ে যাবে। কিন্তু সময় পেলেই সকলে জিজ্ঞাসা করবে, কটা বাজে?

তারপর আসবে সেই চরম ক্ষণ। হঠাৎ কী হবে বুঝতে পারব না—অষ্টগ্রহের টান, প্রচণ্ড শব্দ এবং বিস্ফোরণে সম্বিৎ হারিয়ে শতধা-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর একটা বড় অংশের সঙ্গে আমি ছিটকে পড়ব মঙ্গল গ্রহে, আমার পরিচিত মানুষের কেউবা যাবে চাঁদে, কেউ বুধে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি আকাশবাণীর ঘোষণাকারীর মতো মোলায়েম কণ্ঠে দিগ্বিদিকে বেতার-ভাষণ পাঠাব—'হ্যালো, জৈমিনি কলিং। দিস ইজ মার্স। হ্যালো—।' কী ভয়ানক সেই উত্তেজনা, কি থ্রিল!

কিন্তু কিচ্ছু হল না।

দেখে শুনে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। জীবনস্মৃতির এক জায়গায় তিনি তাঁর প্রথম ট্রেন-চড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

'সত্য (কবির সমবয়সী ভাগিনেয়।—লেখক) বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট, পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশানে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু, গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়ত গাড়ি-ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাষ না পাইয়া মনটা বিমষ হইয়া গেল।'…

আমারও ঠিক সেই অবস্থা। তবে আগেই বলেছি, আজ মাত্র রবিবার। সোমবার এখনো আসেনি। কাজেই কবির মতো আমারও মনে হচ্ছে 'এখনো হয়ত…আসল অঙ্গটাই বাকি আছে।'

বলা যায় না, তেমন সময় হয়তো সত্যিই এসে যাবে, যখন জৈমিনি ধরাধাম ত্যাগ ক'রে চলে যাবে মঙ্গল গ্রহে, এবং কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুকরণে বললে—

আছি এখন মার্সে
এখানে কই

রেফ্রিজেরেটারের দই।...

আহা, তেমন দিন কি আর আসবে!

## ॥ আটাশ ॥

আমি বাঙালী। এই দেশের বাতাসে আমি প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছি। এর অন্নজলে পুষ্ট হ'য়েছে আমার দেহ, এর ভাষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে আমার মন। এদেশে জন্মলাভ করে আমি ধন্য।

এবং কেবল বাঙালী নয়, আমি হিন্দু। যে উদার বিশ্ববোধের ফলে হিন্দুধর্ম যুগে যুগে নানা বিপরীত ভাবধারাকে নিজের মধ্যে সংহত ক'রে ধর্মের সংহিতা-শাসিত গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনচর্যার এক মহত্তম উপায় হ'য়ে উঠেছে, আমিও তার অংশীদার। এজন্যে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি অনুভব করি, এই মহান জীবন-যাপন-পদ্ধতি প্রবহমান রাখতে হলে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। অতীতে যেমন বহু পরাক্রান্ত সমস্যাকে সাহসের সঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এ ধর্ম তার জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে, বর্তমানেও তেমনি ছোট বড় সমস্ত সমস্যাকে অতিক্রম করেই আমাদের এগোতে হবে।

কিন্তু আমি ধর্মসংস্কারক নই। একজন সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালী ধর্ম-সম্বন্ধে যতোটুকু বোঝেন আমি তার চেয়ে একবর্ণও বেশী বুঝিনে।

কাজেই, ধর্ম কী এবং কী নয়, সে সব উচ্চ-বিতর্কে আমি একান্তই অনধিকারী।

তবু আমার মতো মানুষেরও সমস্যা আছে। এবং আমি অনুমান করি, এ সমস্যা আমাদের অনেকেরই। ধর্মের সাধনতত্ত্বের দিকটা গোপন ও ব্যক্তিগত। কিন্তু তার একটা আচরণগত দিক আছে। সেটা প্রকাশ্য। আমরা সমাজের শতকরা নিরানব্বুই জন মানুষই এই আচরণগত দিকের সঙ্গে সংপৃক্ত। এ সব ব্যাপার আমরা আলোচনা করলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা যায় না। বরং, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এ সব ব্যাপার চিরকালই আলোচনা করেছে এবং নিয়ত আলোচনার ভিতর দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করেছে, এইটে বলাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। সেই নজীবে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমিও একটি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। আমার পাঠকবর্গের কাছ থেকে আমি উদারতা প্রার্থনা করি।

আমার বিষয়বস্তু, বল হরি···হরিবোল!

চমকে ওঠবার কারণ নেই! আমি মোটেই রসিকতা করছিনে, আমার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুতর।

মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঐ মিলিতকণ্ঠে উচ্চারিত হরিধ্বনি আমরা সকলেই শুনেছি। এবং মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেছি। চারিদিকেব চলমান জীবনযাত্রার মধ্য থেকে একটি মানুষ চিরকালের জন্যে চলে গেল, এতে কার না দুঃখ হয়! কিন্তু সেইটুকুই কি সব? না, আমি তা বলতে পারব না। সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঐ উচ্চারিত হরিধ্বনির ফলে আমি যতো না অনুভব করেছি সদ্যমৃত ব্যক্তিটির জন্যে বেদনা, তার চেয়েও বেশী

উপলব্ধি করেছি নিজের মৃত্যুর বিষয়ে আতঙ্ক।

বাস্তবিক, 'জন্মিলে মরিতে হবে' এ সত্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমাদের আজীবন প্রচেষ্টা হল সেই কঠোর সত্যটাকে ভুলে থাকা। আমাদের জীবিকা-নির্বাহের সহস্র রকম উদ্যোগ-আয়োজন থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র পসরা সবই জীবনের দিকে চালিত, জীবনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মৃত্যুর সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখাই আমাদের আজন্মলালিত আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে আচম্কা হরিধ্বনি শুনলে বুকের মধ্যে একবার ধক্ করে ওঠে বইকি।

বরং একটু বেশীই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়, শব্দটা যদি শোনা যায় গভীর রাত্রে। এবং আপনি থাকেন একা। অপরিচিত মৃত ব্যক্তিটি তখন আর ঠিক যেন অপরিচিত থাকেন না। সুপরিচিত লক্ষণগুলির মধ্যে তাঁর বিদেহী আত্মা যেন অবয়ব লাভ করতে থাকেন। এবং যাঁকে জীবনে হয়তো কখনো দেখেননি, জীবদ্দশায় যিনি হয়তো ছিলেন অত্যন্তই একজন মানবহিতৈষী ব্যক্তি, তিনিই কিছুকালের জন্যে মানবশত্রু হিসাবে রূপায়িত হ'তে থাকেন আপনার মনের মধ্যে। যারা সোৎসাহে হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে যান, মৃত ব্যক্তির সেই সব আত্মীয়বন্ধু একথা অনুমানও করতে পারেন না। পারলে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হতেন। এবং শোকপ্রকাশ বা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার অন্য উপায়ের কথা ভাবতেন।

কিন্তু এই ভয়াবহতাকে বাদ দিলেও ব্যাপারটার অন্য একটি দিক আছে, যা অত্যন্তই করুণ এবং হৃদয়হীন। কলকাতার মত জনবহুল শহরে মরণাপন্ন রোগীর অভাব নেই। যে বৃদ্ধ জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শায়িত, কিন্তু যাঁর চেতনাও আচ্ছন্ন হয়নি, বাড়ীর পাশে অকস্মাৎ

হরিধ্বনি শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর মনে, কেউ ভেবে দেখেছেন কি? কিংবা ভেবে দেখুন সেই রাত্রিজাগরণক্লান্ত মায়ের কথা যিনি মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে বসে আচম্‌কা শুনতে পান হরি-ধ্বনি! আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যে-মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় উচ্চারিত হয় এই হরিধ্বনি, তাঁর কণ্ঠে ভাষা থাকলে তিনিও এতে আপত্তি জানাতেন। কিন্তু ভাষা যাদের কণ্ঠে জীবন্ত হ'য়ে আছে, মৃতদেহকে বহন করার সময় তাদেব মন হয়তো হ'য়ে যায় মৃত, তাই তারা তা টের পায় না। এবং যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে যায় পর্যায়ক্রমিক হরিধ্বনি। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

আমি তাই অনুরোধ জানাই, প্রত্যেকটি সৎ নাগরিককে এ বিষয়ে বিবেচনা করতে, এবং পবিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে, যা প্রতিবেশীর বিষয়ে সহানু-ভূতিশীল এবং মানবিক। অভ্যাসের জড়তা কোনক্রমেই শ্রদ্ধনীয় হতে পারে না।

## ॥ উনতিরিশ ॥

ভদ্র মহোদয়গণ! আমি কালাপাহাড় নই। নির্বিচারে সৌন্দর্য-ধ্বংস করাই আমার জীবনের পরম ব্রত নয়। পরন্তু আমি বর্তমান কালের মানুষ, এবং একালে রচিত শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবে একজন

সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে-পরিমাণে চিত্তোৎকর্ষ ঘটা সম্ভব তাও আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আধুনিক যুগের কথাসাহিত্য আনন্দের সঙ্গে পাঠ করি, আধুনিক কবিতাও কিছু পরিমাণে আমাকে নাড়া দেয়। একালের সিনেমার আমি একজন উৎসাহী ভক্ত, আধুনিক রঙ্গমঞ্চও আমাকে অনেকখানি আশান্বিত করে তোলে। কিন্তু, হায়, আধুনিক গান এবং আধুনিক চিত্রশিল্প আমাকে কিছুতেই আনন্দিত করতে পারে না--এতে আমি উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করি।

গানের কথা আগে একবার নিবেদন করেছি, পরে না হয় আমার বলা যাবে। এবার চিত্রশিল্পের বিষয়ে আমার চিত্তবিক্ষোভের কারণ নিবেদন করি।

চিত্রশিল্প অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে বলে ছবি, সেটা নেহাৎই চোখে দেখার ব্যাপার। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাগজ বা ক্যানভাসের উপর রঙ আর রেখার সাহায্যে রূপের আভাস ফুটিয়ে তোলাই বোধহয় ছবির স্বধর্ম। রূপ বস্তুটির এমনি মহিমা যে দেখা মাত্রই মানুষকে তা আকৃষ্ট করে। অবশ্য 'মানুষ' বলে কোনো সাধারণ গণ্ডি টানা আজকের দিনে ভুল তা আমি স্বীকার করি। যে অর্থে সব মানুষই আজকের দিনে ভোটের অধিকারী সেই অর্থে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যে শিল্প-সচেতন হবে এমন কোনো কথা নেই। সভ্যতার বিস্তীর্ণ ইতিহাস অতিক্রম ক'রে শিক্ষিত মানুষ আজ এমন ধরনের সূক্ষ্ম রসবোধের অধিকারী যা আমাদের আদিম যুগের পূর্বপুরুষ কিংবা বর্তমান যুগের অ-সংস্কৃতচিত্ত মানুষের অনধিগম্য। কাজেই একালের ছবিও একালের শিক্ষিত মানুষেরই

প্রত্যাশী—যে মানুষ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়িক অর্থেই শিক্ষিত নয়, যার চোখজোড়াও চিত্রদর্শনে শিক্ষিত।

এ সবই আমি সবিনয়ে মেনে নেব। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি নিবেদন করব, ছবি দেখার প্রাথমিক শর্তে ফেল হ'য়ে যাই এমন দর্শক হয়ত আমি নই। অন্তত, আমাব মতো দর্শককেও যদি অস্পৃশ্য জ্ঞানে সরিয়ে রাখতে হয় তাহলে কলকাতার মতো শহরে ছবিব এগজিবিশান খোলাব যে কোনো মানেই হয় না, সেটা আমি সরবেই ঘোষণা করব। কারণ, অপ্রিয় সত্য হলেও আমি বলতে বাধ্য, ও-সব প্রদর্শনীতে যাঁরা নয়ন সার্থক করতে (এবং করাতে) যান তাঁরা শতকরা নিরানব্বই জনই আমার মতো দর্শক। তাঁদের যদি বাদ দিতে হয় তাহলে প্রদর্শনী ঘবের চারদিকে ছবি টাঙানোর পর সদব দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ কবে দিয়ে উদ্যোক্তাদেরই পরস্পরকে বাহবা দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তব থাকবে না।

হয়তো সদব দরজা খোলা রেখেও পরিণামে ব্যাপারটা ঐ রকমই দাঁড়ায়। প্রদর্শনীটির উদঘাটনেব জন্যে যদি কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তিনি অনিবার্যভাবেই ছবির বিষয়ে কতকগুলি মামুলি কথা বলে কর্তব্য সমাধা করেন। কিংবা, শিল্পী যদি প্রভাব-শালী ব্যক্তি হন, তাঁব বরাতে জোটে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যার এক বর্ণও যদি সত্যি হত তাহলে অনায়াসে তিনি স্থান পেতেন পিকাসোর পাশে।

কিন্তু এসব কথা না হয় বাদ দিলাম। প্রশংসা না করলে শিল্পীরা তাঁদের আদর কবে ডেকে আনবেন কেন? সে কথা যাক। ছবি দেখার পর শিল্প-সমালোচকেবা যা বলেন এবং লেখেন সেইটেই

হল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বাংলা দেশে, ছবির সমালোচনাও যেন সেই ধরনেরই একটি উচ্চমার্গের আর্ট! জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল, জ্যামিতিক প্যাটার্ন এবং সর্বশেষে কিন্তু সর্বোপরি সেই অ্যাবস্ট্রাকট ফর্ম—এই কথাগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রয়োগ করাই হল চিত্র-সমালোচনার পরম কৌশল। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, সমালোচকেরা ছবির বিষয় কিছু বোঝেন না। অনেকেই সম্ভবত বোঝেন। কিন্তু তারা তো ভ্যাকুয়ামের মধ্যে কাজ করেন না, কাজ করতে হয় একটা পরিবেশের মধ্যে। সেই পরিবেশের আচরণবিধিই সর্বপ্রযত্নে মেনে চলেন তাঁরা। ফলে যেমন করে সমালোচনার কথা বলা রেওয়াজ তেমনি করেই বলেন তাঁরা। এবং পরিণামে একটি ছবির প্রদর্শনী থেকে অন্য প্রদর্শনীর বিন্দুমাত্র গুণগত পার্থক্যও তাতে ধরা পড়ে না।

এ এক অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ: মুড়ি আর মিছরি এখানে প্রায় সমান দরে বিকোয়। ফলে একদিকে যেমন এখানে প্রকৃত গুণগ্রাহিতা অভাবে ক্ষমতাবান শিল্পী মাঝারীর ভিড়ে হারিয়ে যান, অন্যদিকে তেমনি সহজে বাহবা কুড়োনোর প্রলোভনে অজস্র অপটু ভাগ্যান্বেষীর সমাগম ঘটতে থাকে। বস্তুত কিছুকাল যাবৎ এঁদের ভিড়ই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যেন।

যে-কোনো ব্যক্তি তুলি-ধরা শিখেই দেখছি আজকাল ছবির এগজিবিশানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছেন। দু'খানি হাত থাকলেই যে ছবি আঁকা যায় না, অনেক প্রদর্শনী দেখেই সেটা বিশ্বাস হয় না। অ্যাবস্ট্রাকশানের নামে অজস্র বিকৃতি পঙ্গপালের

মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চারদিক থেকে। বিমূঢ় সমালোচক ও দর্শক তাদের ব্যাখ্যা করার জন্যে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছেন।

কিন্তু আসল কথাটা কেউই স্পষ্ট ক'রে বলছেন না। সেটা হ'ল এই যে, অধিকাংশ ছবিই ছবি নয়, চিত্রকরেরাও বেশীর ভাগই শিল্পী নন। তাঁরা হলেন নকলনবীশ, বিদেশী ছবির নিকৃষ্ট প্রতিলিপির অক্ষম অনুকারী মাত্র। তাই বেশীর ভাগ আঁকিয়েরই নিজের কোনো অঙ্কনশৈলী নেই, চারিত্র্য নেই, এবং বক্তব্য তো নেই-ই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যে কয়খানি ছবি এঁরা এগজিবিশানে হাজির করেন তার বেশী ছবি এঁরা আঁকেননি অনেকেই। সাধনার কথা দূরে থাক, যে-কোনো শিল্পরূপের মতোই ছবিও যে একটি নিয়ত চর্চার যোগ্য বস্তু তাও এঁরা জানেন কিনা সন্দেহ। হুজুগের টানে দু দশ টুকরো ক্যানভাসের উপর রঙ বুঝিলেই এঁরা ছোটেন এগজিবিশান করতে, এবং সেই সব এগজিবিশানেই আমরা চোখ গোল করে ঢোক গিলতে গিলতে বাহবা দিতে থাকি। আত্মছলনারও একটা সীমা থাকা দরকার।

আমরা ছবি চাই, ভালো ছবি। আমরা এমন সব প্রদর্শনীতে গিয়ে দাঁড়াতে চাই যেখানে উপস্থিত হলেই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আমাদের সচেতন করে তুলবে। আমরা পরিচিত জীবন ও জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অস্তিত্বের অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাব। আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত আরো একটু প্রসারিত হ'য়ে মানুষ হিসাবে আমরা কিছুটা পরিবর্তিত হব—সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হব।

তেমন ছবি যদি খ'য়ে খ'য়ে না পাই, ক্ষতি নেই, দু দশখানা

পেলেই খুশি আমরা। কিন্তু আগাছাকেই মনোরম উদ্যান বলার ভ্রান্তিবিলাস থেকে মুক্তি চাই। সমালোচকেরা কঠিন হাতে নিড়ানি ধরুন। জাত ফুলের গাছ যদি একটি কি দুটিও থাকে তো সেগুলি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক—কুসুমিত হয়ে উঠুক। এই অযোগ্যের ভিড় অসহ্য!

## ॥ তিরিশ ॥

নেশা, বিশেষ করে পানাসক্তির বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সকলেই জানেন কলকাতায় মদ্যপানের ঝোঁক কেমন হুহু করে বেড়ে চলেছে। তার কারণ কী? মনোবিকার অন্য একটা কারণ। কিন্তু বিষয়টা তাই বললেই হয় না। কেন ঘটেছে এই মনোবিকার সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা যায়। বিষয়টাকে একটু অন্যদিক থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করা যাক।

সুস্থ মনের ধর্ম হল এই যে, সে একটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। একে বলা যায় তার আদর্শ। এবং এই আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্যে তার যে আচার-আচরণ তাই দিয়েই তৈরী হয় তার way of life বা জীবনবেদ।

বলা বাহুল্য, এ বেদ ঋষিদের বেদ নয়। জীবনকে আমি যেভাবে পেতে চাই, যেভাবে আমি জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠতে চাই তারই উচ্চাভিলাষ দিয়ে তৈরী হয় এই জীবনযাত্রার প্রণালী।

এর মধ্যে একটা নৈতিক বিচার আছে। কিন্তু আমি সে কূট-তর্কের মধ্যে যাব না। কারণ কোন্‌টা সুনীতি আর কোন্‌টা দুর্নীতি এর কোনো সহজ সমাধান নেই। আমি তাই ওসব গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে উল্লেখ করব সমাজের কথা, রুচির কথা। এবং এইদিক থেকেই, নৈতিক প্রশ্ন না তুলেও চুরি করে বড়লোক হওয়ার way of life-কে আমি ধিক্কার দেব।

কিন্তু উপস্থিত কালের গণ্ডির মধ্যে নেমে এসে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? সমাজেব আজ ছত্রভঙ্গ অবস্থা, ব্যক্তিগত রুচি বিপথগামী। প্রত্যেকেই আমরা নিজের জীবনটাকে নিয়ে ফাটকা খেলছি, এবং যতো হেরে যাচ্ছি, ততোই হ'য়ে উঠছি মরীয়া। এই নিঃস্বতাই আজ ব্যাধির মতো ফুটে বেরিয়েছে আমাদের আচার-আচরণে।

সুস্থ মন তাই এখন সুদূরের স্বপ্ন। লক্ষ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্ত মনের হিষ্টিরিয়াতে প্রতিনিয়ত উত্তেজনার খোরাক না জোটালে পদে-পদেই দেখা দেয় শূন্যতা আব অবসাদ। মদ্যপান তাব একটি দিকের চেহারা। ওরই সঙ্গে গা মিশিয়ে রয়েছে তিন তাসেব খেলা, ফাকা সাহেবীআনা, এমন কি সংস্কৃতিচচার বহিরঙ্গ-বিলাস।

স্বাধীনতা লাভের অন্য যতো সুফলই হোক, জাতি হিসাবে ক্রমে আমরা নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি, আমাব এ আশঙ্কাকে কিছুতেই আব চাপা দিয়ে রাখতে পারিনে। যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন একটা লজ্জা ছিল, জেদ ছিল। আমরা আমাদের বিদেশী শাসকদের সমকক্ষ হ'য়ে দেশকে স্বাধীন করব এই লক্ষ্যেব দিকে নিয়োজিত ছিল আমাদের মন। এবং বাধা যতোই প্রবল হ'য়েছে ততোই যেন বেগবতী নদীর মতো তরঙ্গের শিখরে শিখরে তাকে অতিক্রম করার

জন্যে উন্নত হ'য়ে উঠেছি আমরা। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর যেন কেমন এক পরিতুষ্টিতে সব-পেয়েছির দেশে চলে গেলাম, আর দিনে দিনে আমাদের মনের নদীতে চড়া পড়তে লাগল। আমরা সমুদ্রের কথা ভুলে গেলাম। আমাদের পাঁকের জলে আর তৃষ্ণা মেটে না।

কাজেই উত্তেজনা চাই। মদের আড্ডায় যেতে আর লজ্জা নেই। আমরা স্বাধীন যে। জাতীয় কলঙ্ক তো কিছু নেই। মাথা উঁচু ক'রে 'বারে' ঢোকো। তারপর নেহাৎ যদি ব্যাপারটাকে রামা-শ্যামার মতো 'মোদো' ব্যাপারই মনে হয় তো, পানীয়টার নাম দাও 'ড্রিঙ্কস্'—ব্যাস্, সাতখুন মাফ। আর তাতেও যদি বিবেকে কাঁটা ফোটে তো, পানপাত্র হাতে সাংস্কৃতিক আলোচনা শুরু কর। ডীলান টমাস, কাফ্‌কা, মাতিস্, বাখ্, কিম্বা সিনেমার নিওরিয়ালিজম, রবীন্দ্রনাথের ভার, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্...! বিদগ্ধ বলে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

এমনি এক ঘরোয়া অভিজ্ঞতার কথা জানি। নিজে গাড়ী চালিয়ে এসেছিল যুবকটি। মেয়েটি বসে ছিল নাইলনের শাড়ী পরে। সামনে 'স্কোর পিতা আলুর চাষ করিতেন যে-স্কটল্যাণ্ডে সেইখানে প্রস্তুত এক নৈকষ্য কুলীন পানীয়। আন্দ্রিককে সাহিত্যের পরীক্ষায় মোটা-মুটি একটা পাশ-নম্বর দিয়ে যুবকটি যখন সবে প্যার্সের দিকে থাবা বাড়িয়েছে এমনি সময় বিহ্বল গদগদভাবে তরুণীটি প্রশ্ন করল, 'টুকুদা, আমায় একটু ফ্রেঞ্চ শিখিয়ে দেবে?'

'ফ্রেঞ্চ?' একটা হেঁচকি তুলে থেমে পড়ল যুবকটি।

'কেন, পারব না শিখতে?'

'না, তা পারবে না কেন? দেব'খন শিখিয়ে। যা বলছিলাম, প্যার্সের কবিতার সঙ্গে রিল্‌কের একটা অদ্ভুত—!'

'তুমি জার্মানও জানো' ধনুকের মতো ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল তরুণীটি।

'জানি। মানে, অল্প-স্বল্প। গ্যয়টে পড়বার সময়—!'

'তা হোক অল্প। ওতেই হবে। আমাকে ওমনি একটু জার্মানও শিখিয়ে দেবে। উমাটার বড় বাড় বেড়েছে দুপাতা জার্মান উল্টে।'

'কী সিলি, শিখবে নিজের কালচারের জন্যে।' যুবকটি জ্ঞানগর্ভ হাসির সঙ্গে মন্তব্য করল, 'তাছাড়া জার্মানটা অতো সহজও নয়।'

'হোক না কঠিন। তুমি শেখাবে না, তাই বল।'

'কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলছি। হবে'খন একদিন।'

'না, একদিন নয়। কালই শুরু করব। আসছ তো?'

'নিশ্চয়ই! বাঃ—!'

বলা বাহুল্য সে আসেনি। শুধু কাল নয়, কোনোদিনই আসতে পারেনি। এ বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরদিনের মতোই রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

কিন্তু হলে হবে কি? এ তো নিজের ইচ্ছায় ঘটে না। এযে একটা ব্যারাম, হিষ্টিরিয়া! এই অন্তঃসারশূন্যতার হাত থেকে তাদের অব্যাহতি কোথায়! শুধু যতো দিন যায় ততোই বেড়ে ওঠে এই দেউলিয়াপনা, আর সেই সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলে শুঁড়ির দোকানের বিল। নান্য গতিরন্যথা।

## ॥ একচল্লিশ ॥

আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রায়ই আবৃত্তি করা হত। কবিতাটির নাম বন্দী বীর। ইদানীং রুচি-পরিবর্তনের ফলে সেই কবিতাটি 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' ইত্যাদি সঙ্গীত-নৃত্যের সঙ্গে পশ্চাদপটে সরে গেলেও, তার কয়েকটি পংক্তি এখনও সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে আমার মনে। সেগুলি হল এই রকম—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

কে জানত, পংক্তিগুলির এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এই কয়দিনের নাগরিক জীবনের ইতিহাসে। 'প্রাণ দান', অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনসেবার জন্যে এমন 'কাড়াকাড়ি' কাণ্ড এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করা গেছে কিনা সন্দেহ!

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়, ময়লা পরিষ্কার। কিন্তু তাই নিয়ে যে এ ধরণের একটা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ঘনিয়ে উঠতে পারে তা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারিনি।

অবশ্য একথা ঠিক, রাস্তায় বসানো ময়লা-ফেলার ডাস্টবিনগুলোর গায়ে লেখা থাকতে দেখা গেছে 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে'। তবে সে বিজ্ঞপ্তি যে সেবার সদিচ্ছায় জাগ্রত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও

প্রযোজ্য হবে তা কখনো অনুমান করা যায়নি। কার্যকালে দেখা গেল, সরকারী পরামর্শে নিযুক্ত আবর্জনা-পরিষ্কারকারী সংগঠন সেই ধমকানিতেই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হ'য়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি আলাপ-আলোচনার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে তা অনেক দূরে। মাত্র মাস-খানেক সেবা করার সুযোগ পাবেন তাঁরা। এই সময়ের মধ্যে শহরের সব থেকে বেশি আবর্জনা-আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে একটা মোটামুটি সেবা করে, আমাদের আবর্জনা-সচেতন করে, রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করবেন। স্থায়ীভাবে সেবা করার মৌরসী অধিকার থাকবে কর্পোরেশনেরই করায়ত্তে।

উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এ কথা মিথ্যা। বরং ভাগের মা-ই তাড়াতাড়ি গঙ্গালাভ করে। অন্তত বর্তমান ক্ষেত্রের শিক্ষা থেকে সেই সত্যই হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম আমরা।

মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির জন্যে এক গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম, কানে এসেছিল এক টুকরো খণ্ডিত সংলাপ। (এর মধ্যে 'স' ও 'শ'য়ের উচ্চারণ হবে ইংরাজীর এস্-এর মতো।)

প্রথম কণ্ঠ: একে শালা বিষ্টি, তার উপরে আবার ঐসব কাণ্ড! দেশ উদ্ধারের ঠাঁই পেলনি কত্তারা। যত্তো সব ইয়ে—?

দ্বিতীয় কণ্ঠ: আরে ঘাবড়াস কেনে? দেখিস, ওসব কিসসু হবে নি।

প্রথম: কেনে? এবার কোমর বেঁধে লেগেছে, বুইলি। ময়লা কুড়োনোর পাট গুটোতে হবে।

দ্বিতীয়: ইল্লে-ইল্লে, গুটোলেই হল। শালা, খাব কী করে?

কথায় বলে, সাত পুরুষের ব্যাবসা. ডকে উঠলেই হল ? দেখিস সব ফেঁসে যাবে।

প্রথম : যাঃ ?

দ্বিতীয় : ( হাস্যসহকারে ) হ্যাঁরে হ্যাঁ। মুরোদ সব জানা আছে। কত্তো এল, কত্তো গেল। তা শ্‌লা, ময়লা যেমনকে তেমনি রইল। আরে বাওয়া, আমাদের কপালটেও ভাব দিকিনি ? ময়লা না থাকলে এ ঘেন্নার ব্যাবসা যাবে কনে ? তা আমাদের এই পোড়া কপাল যদ্দিন, ময়লাও তদ্দিন। কুছ পরোয়া নাই !...

বুঝতেই পারছেন, এরা ময়লা কাগজ ইত্যাদি কুড়োনো-ওয়ালা। সেদিন তাদের কথাবার্তা শুনে মনে মনে হেসেছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম ওরা হতাশ হবে, শহরে আর আবর্জনা পাবে না ওরা। কিন্তু দেখছি, হাসবার পালা ওদেরই। মাছ যেমন জলকে চেনে, আমাদের চেয়েও তেমনি প্রাণ দিয়ে চেনে ওরা এই শহরকে। ওরা হতাশ হবে না।

ময়লা থাকবে। সাময়িকভাবে হয়তো অদৃশ্য হবে কোনো কোনো অঞ্চল থেকে। কিন্তু মাসখানেক পরেই রীতিমত হাওয়া-বদল করে হৃষ্টপুষ্ট আকারে ফিরে আসবে যথাস্থানে। এবং ততদিনে যেহেতু আমাদের করালবদনা কলেরাদেবী প্রতিদিন অজস্র মানুষের আয়ু ভক্ষণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, সেইহেতু আবর্জনার স্তূপ যে বিশেষ রকম একটি আলোচ্য বস্তু, তাও হয়তো আমরা ভুলে যাব।

অবশ্য কর্তৃপক্ষ আশা করেছেন, ইতিমধ্যে নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অনেকটা ধাতস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই গল্পে-বর্ণিত মেছুনির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই ?. একরাত্রে গৃহস্থ-

বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সে চারিদিকে মেছো গন্ধ না পেয়ে শেষে আঁশ-বঁটি পাশে নিয়ে ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল ? আমরাও কি সেইরকম চিরপরিচিত দুর্গন্ধের বদভ্যাসে সলিলসমাধি লাভ করিনি ? এত সহজেই তার থেকে উদ্ধার পাব ?

মনে তো হয় না। আমি দুর্জন নই, ভালো কাজের মধ্যে খুঁৎ আবিষ্কার করে বাহবা নিতে চাইনে। কিন্তু সত্যিই ভেবে দেখুন তো, আইন এসে লাঠি উচিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত, কোন্ ভাল কাজটা আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি ? সতীদাহ, বহুবিবাহ থেকে শুরু করে শহরের যানবাহনে ধূমপান করা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই রয়েছে আইনের ধমক। কাজেই নোংরামির এই আজন্মসঞ্চিত স্বভাবও যে নিজের তাগিদেই কাটিয়ে উঠব আমরা, এমন ভরসার কারণ খুঁজে পাইনে।

আমরা চির-নাবালক। আমাদের অভিভাবকত্ব দরকার। আইন মহারাজ যতোদিন না সেই কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে ততদিন কোনো ভালো কথাই আমাদের কানে ঢুকবে বলে মনে হয় না। ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছে, হোক। কিন্তু সেইসঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—একটি আইন পাশ করুন, যাতে আমরা নোংরা থাকতে ভয় পাই। এবং—

এবং অকালবৃদ্ধ জন্ম-হাবার মতো প্রতিনিয়ত সেবা-গ্রহণ করতেও লজ্জাবোধ করি।

## ॥ বত্রিশ ॥

ভেজাল। সম্প্রতি একজন মহামান্য ব্যক্তি বলেছেন, বাজারে যতো ওষুধ আর যতো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তার আধাআধিই ভেজালে ভর্তি। কথাটা নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেই আমরা জানি এ তথ্য। কিন্তু উক্ত মহামান্য ব্যক্তির মতো মানুষ যখন এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন, তখন বিষয়টা নতুন করে ভাবতে হয় বইকি!

ভেজাল! কথাটার মধ্যে কেমন একটা ইতরভাব ছাপ রয়েছে যেন। গোলাপ বললে যেমন কবিত্বময় বর্ণ-সুষমা ভেসে ওঠে মনের সামনে, ভেজাল বললেও তেমনি নাকে এসে লাগে সুড়ঙ্গচারী দুর্গন্ধ। এবং কেবল তাই নয়। ঐ কথাটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আতঙ্ক, ষড়যন্ত্র এবং মৃত্যু। সেদিক থেকে ভেজাল আর ভেজালি যেন সগোত্র, দুয়ের মধ্যেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে আকস্মিক হত্যার বিদ্যুৎ-শিহরণ।

তাই, 'ভেজাল হইতে দূরে থাকিও।'—পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেরই সারমর্ম হল এই কথা। কিন্তু ভেজাল তবু আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। কুসুমে কীটের মতো আমাদের এই দেবত্ব-অভিলাষী মনের মধ্যেও রয়েছে শয়তানের রাজত্ব। পাঁচ হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টাতেও তাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। বরং দিন যতো কাটছে ততোই যেন সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে ভেজালের ঐন্দ্রজালিক চেহারা। প্রাচীনকালের

পরব্রহ্ম এবং হালআমলের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার মতো সর্বভূতে ছড়িয়ে পড়ছে তার অখণ্ড প্রতাপ। লক্ষ টাকার হীরে থেকে চার পয়সার জিরে পর্যন্ত তার অস্তিত্ব।

কথাটা নিছক ভাবের ঘোরে লেখা নয়, ঘটনাগত সত্য। বছর কয়েক আগে স্বর্গত রাজশেখর বসু ভেজালের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাতে অন্যান্য অনেক খাদ্যদ্রব্য ও মশলা ইত্যাদির মধ্যে জিরের নামটাও ছিল। যতোদূর মনে পড়ে, সেখানে মাটি দিয়ে জিরে তৈরি করে রঙেব পলেস্তারা লাগানোর কথা বলা হ'য়েছিল। পড়ে শিহরিত হ'য়ে উঠেছিলাম, না ভয়ে নয়, মানুষের উদ্ভাবনী কৌশলের বিস্ময়ে। এত যত্ন ক'রে যারা ভেজাল তৈরী করে, ধরা পড়লে কেন যে আমরা তাদেব উপুর খাপ্পা হয়ে উঠি সেইটেই আশ্চর্য।

কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, ভেজাল যারা দেয় তারাই কামনা করে ভেজালটা তাদের জানাজানি হ'য়ে যাক্? গোয়েন্দাকাহিনীর ডাকসাইটে অপরাধী যেমন হতাশ গোয়েন্দাকে উদ্রিক্ত করে তোলার জন্যে নিজে থেকেই দু-একটা সূত্রের জোগান দিয়ে যায়, তেমনি ধরনের ব্যাপার হলেও অবাক হব না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ভেজালদানকারীদের আচরণ এমন বেপরোয়া যে সেটা আমাদের ভেজাল-নিরোধের ক্ষমতার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

চালের মধ্যে কাঁকরের অস্তিত্ব তো সর্বজনবিদিত। সে উদ্দেশ্যে পাথরগুঁড়ো করার কল আমদানী হ'য়েছিল তাও বলতে শুনেছি অনেককে। কিন্তু কাঁকর তাতে বাজার ছেড়েছে কি? ধানের

ফলন কম হয় যে বছর আর বাজারে দেখা দেয় চালের অনটন, তখনই আবির্ভাব ঘটে কাঁকরের। আমরা সবই বুঝি, কিন্তু ধরতে পারি না। বাড়ির পরিচারককে ধমকাই, পাড়ার মুদিখানার মালিকের কাছে অভিযোগ পেশ করি এবং বন্ধুমহলে আবৃত্তি করি কবি অজিত দত্তের কালজয়ী ছড়া—

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না-খেয়ে
চালে ও কাঁকর আধাআধি থাকে হে।

কিংবা ধরুন সরষের তেল। শেয়ালকাঁটার বিচি মেশানোর ইতিহাস বহু-আলোচিত। কিন্তু এমনিতে তার হদিশ পাওয়া যায় না। হঠাৎ যেই শহরে বেরিবেরি ইত্যাদির হিড়িক পড়ে যায়, অমনি টনক নড়ে ওঠে কর্পোরেশন বাহাদুরের। দু-একটা তেলের গুদামে তালাচাবি পড়ে, মামলা হয়, কিন্তু তারপর কী হয় তা আমরা কেউই জানতে পারি না।

আর শুধু কি খাদ্যদ্রব্য ? এই তো কয়েক বছর আগে ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে ধরা পড়েছিল ভেজাল ওষুধ তৈরির এক চোরাই কারখানা। শুনে চমকিত হয়েছিলাম, তারা মুমূর্ষু রোগীর ব্যবহার্য কোরামিন ইনজেকশানের অ্যামপুল পর্যন্ত ভেজাল মালে ভর্তি ক'রে বাজারে পাঠাতো। এরপর আর বলার থাকে কী ?

কিন্তু সেই অপরাধে কেউ যে দ্বীপান্তরে গেছে এমন খবর শুনিনি।
এবং শুনিনি বলে আশ্চর্যও হইনি।

বরং আশ্চর্য হ'য়েছি এই কথা শুনে যে, কয়েকদিন আগে জনৈক ব্যক্তি সোডার বোতলে ভেজাল আছে মনে ক'রে অপরাধী ধরার জন্যে কী পরিমাণে মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন।

ঘটনা বিবরণে জানা গেছে, এক বোতল সোডা কিনে তাতে ময়লা আছে দেখতে পেয়ে তিনি সোডা কোম্পানীকে ফোন করেন। কোম্পানী বোতল বদলে অন্য বোতল ব্যবহার করতে উপদেশ দেয়। ভদ্রলোক এ উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন না, তিনি অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্যে পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে ফোন করেন। এটা হ'ল দু-নম্বর ফোন। পুলিশ বলল, এ অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করার এক্তিয়ার তাদের হাতে নেই, খবর দিতে হবে কর্পোরেশন ফুড ইন্সপেক্টারকে। ভদ্রলোক নিরস্ত হলেন না, তিনি ফোন করতে লাগলেন। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ফোন করতে হল যথাক্রমে ফুড ইন্সপেক্টার, ডিষ্ট্রিক হেল্‌থ্‌ অফিসার এবং হেল্‌থ্‌ অফিসারকে। ক্যারামের ঘুঁটির মতো ঠোকা খেতে খেতে এই শেষ পর্যায়ে এসে জানা গেল, বোতলটি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে জমা দিয়ে লিখিত অভিযোগ পেশ না করলে তাঁদের কিছু করার উপায় নেই।

বুঝুন ব্যাপার। সোডার দাম যদি হয় ২৫ নয়া পয়সা তো সেই সোডা খাঁটি খাচ্ছেন কি ভেজাল খাচ্ছেন এ প্রশ্ন তুলতে পাঁচটি টেলিফোনের জরিমানা দিয়েও আপনি যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই থেকে যাবেন। ঘণ্টা দুয়েক সময় নষ্ট অবশ্য ফাউ!

কিন্তু নষ্ট করার মতো পয়সা এবং সময় যেহেতু সকলের অঢেল নয়, সেইহেতু ভেজাল-ধরার সৎ প্রবৃত্তিও এখন উপহাসযোগ্য। এবং ভেজালের সংসারে ভেজাল বাড়ছে ঠিক শশিকলার মতোই।

তবে ওর মধ্যেই একটা সুসংবাদ আছে। কিছুদিন আগে উত্তর ভারতের জনৈক মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বিষেও নাকি ভেজাল বেরোচ্ছে আজকাল। অতএব মাভৈ। আমরা যতো তাড়াতাড়ি মরে বাঁচব ভাবছি, অতো তাড়াতাড়ি খেল খতম হবে না।

## * ॥ তেত্রিশ ॥

মৃত্যুভয় মানুষের মজ্জাগত। একবার জন্মগ্রহণ করলে কোনো-না-কোনো সময়ে এ সংসার থেকে বিদায়গ্রহণ করতে হবে এ সত্য অবধারিত, তবু মৃত্যুকে মানুষ যমের মতো ভয় করে। কথাটার মধ্যে একটু পুনরুক্তি থেকে গেল, পাঠক লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? যমই তো মৃত্যুর ঈশ্বর! মৃত্যুকে মানুষ যমের মত ভয় করবে, এ আর বেশি কথা কী? কিন্তু ঐ মহিষারূঢ় কালান্তক দেবতা ছাড়া ভয়াবহতার যে অন্য কোনো তুলনা চলে না এ কথাও সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

একটা ব্যাপার তবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু ঐ অবাঞ্ছিত নিদারুণতার সঙ্গেই তো মানুষ সৃষ্টির আদিতম যুগ থেকে সহাবস্থান করে এসেছে। ফলে

মোটামুটি এক ধরণের বোঝাপড়াও যেন হ'য়ে গেছে ঘটনাটির সঙ্গে। মরতে আমরা ভয় পাই নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ভয়ের বিষয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতেও লজ্জা পাই।

কিন্তু মৃত্যু যখন নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়, এ লজ্জা তখন জীর্ণ বস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করি আমরা। কাকের বাসায় বিপদ-সঙ্কেত 'এলে নিমেষের মধ্যে যেমন হাজার হাজার কাক তাই নিয়ে আর্তনাদ শুরু করে, আমাদেরও অবস্থা ঘটে প্রায় সেই রকম। ঘরোয়া আড্ডা থেকে জনসভার মঞ্চ পর্যন্ত মুখর হয়ে ওঠে কল-কোলাহলে।

এইটেই স্বাভাবিক। মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর নতুনভাবে মরা। এ নিয়ে শোরগোল হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মনে পড়ল একজন ফাঁসির আসামীর গল্প। একই সময়ে আরো একজন অপরাধীর ফাঁসি হওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেই মঞ্চে। গল্পটা গল্পই, কাজেই ফাঁসিকাঠের নিচে একটি প্রবাহমান নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন নয়। দ্বিতীয় অপরাধীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হল আগে। তারপর যেই তার পায়ের নিচের তক্তাটা সরে গেল অমনি সে ঝুলে পড়ল পদতলের গহ্বরে, এবং সেই মুহূর্তেই তার ফাঁসির দড়িটাও গেল ছিঁড়ে। নিচে বলাবাহুল্য খরস্রোতা নদী। শুনেছি, ফাঁসির আসামীকে নাকি তার শেষ ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ দশা ঘটার পর গল্পের নায়ক আমাদের প্রথম আসামীকে যখন তার শেষ ইচ্ছা জানাতে বলা হয়, তখন সে নাকি করজোড়ে নিবেদন করেছিল, 'হুজুর আর কিছু নয়, শুধু দড়িটা বদলে একটা নতুন দড়ির ব্যবস্থা করুন। ফাঁসিকাঠে মরব, সেটা

নতুন নয়, কিন্তু গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় জলে খাবি খেয়ে মরব এটা আমি ভাবতেই পারিনে।'

বাস্তবিক তাই। মৃত্যু নয়, মৃত্যুর নতুনতম মাধ্যমটাই মানুষের সব থেকে বড় আতঙ্কের বিষয়।

হবে না-ই বা কেন? সংক্রামক রোগে এ দেশের মানুষ কবে থেকে মরতে শুরু করেছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। ব্যাপারটা স্মরণাতীত কাল থেকে ঘটছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর সেই জন্যেই এভাবে মরা আমাদের গা-সওয়া হ'য়ে এসেছে। কিন্তু রাস্তার অ্যাক্সিডেণ্টে মরা একেবারেই হাল-আমলের আমদানী। এখনো তার শতবার্ষিকী করা চলে কিনা সন্দেহ! ফলে সে বিষয়ে কৌতূহল এবং কোলাহল এখনো আনকোরা।

ধরুন পুলিশের সূত্র থেকে প্রচারিত এই সংবাদটি—গত জুন মাসে (১৯৬২) যে ছয় মাস শেষ হ'য়েছে বছরের সেই ১৮২ দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে ৬০১৫ বার, অর্থাৎ মোটামুটি দিনে প্রায় ৩৪টি দুর্ঘটনা। কিংবা, আরো একটু সূক্ষ্ম হিসাবে এলে বলা যায় ২৪ ঘণ্টায় বিশ্রামের ৬ ঘণ্টা বাদ দিলে অন্য সময়ে প্রতি ঘণ্টায় দুর্ঘটনা ঘটে অন্তত দুবার করে। আপনি যেখানেই থাকুন, বাড়িতে কি বাজারে কিংবা আপিসে, জেনে রাখবেন ঠিক আধঘণ্টা পরপর একটা করে অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে যাচ্ছে শহরে। এই সব ঠোকাঠুকিতে, পুলিশের পরিসংখ্যানে প্রকাশ, জুন পর্যন্ত ছয় মাসে আহত হ'য়েছে ২১৫০ জন মানুষ, আর মারা গেছে ১৩৫ জন। অর্থাৎ মোটামুটি দিনে প্রায় একজন ক'রে। কাজেই প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় এ কথাও এক রকম সত্য বলেই মেনে নিতে

পারেন, সেদিনের ১৬।১৭ ঘণ্টায় শহরের কোথাও না কোথাও অন্তত একজন মানুষ ইহধাম ত্যাগ করেছে গাড়ির আক্রমণে।

তর্ক উঠতে পারে, সংখ্যাটা এমন আর বেশি কি? নিশ্চয়ই নয়। অসুখ-বিসুখে এর চেয়ে বেশি লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিনই। কিন্তু সেগুলো যে পরিচিত মৃত্যু! পেট্রোল বা ডিজেল-চালিত শকটের ধাক্কায় শমনসদনে যাওয়া একেবারেই এক-জেনারেশনের ব্যাপার। আমাদের রক্তের মধ্যে সে ভয়ের কোনো প্রতিষেধকই তৈরি হয়নি এখনো!

জানি না, কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। পুলিশ জানাচ্ছেন, তাঁরা উন্নততর ট্র্যাফিক আইন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। তা করুন, নিশ্চয়ই করবেন তাঁরা। কিন্তু ততোদিনে গাড়ির সংখ্যাও তো আরো বেড়ে যাবে? এবং বেড়ে যাবে মানুষের সংখ্যা। কাজেই বিপদের মূল কারণ তবু থেকেই যাবে।

এই সব ভেবেচিন্তে একটা মৌলিক উপায় বার করেছি আমি সম্প্রতি। ভ্যাক্‌সিন! কলেরা বসন্ত টাইফয়েড জয় করে এখন আমরা ক্যান্সারও ভ্যাকসিন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলে আশা করছি। ক্যান্সারের চেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট কি কম বিপজ্জনক? আমার বিনীত প্রস্তাব, অচিরাৎ একটা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হোক, যেখানে পথ-দুর্ঘটনার ইঞ্জেকশন তৈরি হবে।

তারপর? তারপর আর ভাবনা নেই, বছরে একবার করে বসন্তের টিকে এবং টি-এ-বি-সি ইঞ্জেকশন নেওয়ার মত শহরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা গ্রহণ করবে অ্যাক্সিডেন্ট প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন। বাঘ-মার্কা স্টেট বাস পর্যন্ত হার মেনে যাবে আমাদের জীবনীশক্তির কাছে।

## ॥ চৌত্রিশ ॥

আবার কামান-গর্জন !

থিয়েটারের ফাঁকা পটকা নয়, সত্যিকার তোপধ্বনির মতোই গুরুতর ব্যাপার। মাছি এবং ষাঁড়-পর্বের পর এবার নজর পড়েছে কুকুরের দিকে। স্থির হ'য়েছে ঐ অবাঞ্ছিত চতুষ্পদ জীবগুলিকেও লোপাট করে দেওয়া হবে শহর থেকে।

বলা বাহুল্য সব কুকুরই অবাঞ্ছিত নয়। যে-সব কুকুর বাড়িতে থাকে এবং গৃহস্থের পুত্রকন্যার সঙ্গে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালিত হয়, তারা বাঞ্ছিত। বিশেষ করে আজকের এই নব্য সাহেবীআনার যুগে কুকুর তো এক অপরিহার্য গৃহোপকরণ। কুকুর না থাকলে যেন আভিজাত্যই খোলে না অনেক বাড়ির। সত্যি বলতে কি, আমি এমন অনেক পরিবার দেখেছি, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কুকুর নিয়েই পাগল। এবং কুকুরের কামড়ে পাগল হওয়ার চেয়ে এই সব কুকুরের আদরে পাগল ব্যক্তিরা যে কম মারাত্মক হ'য়ে ওঠেন না, তাও লক্ষ্য করেছি স্বচক্ষে !

মনে পড়ল, আমার এক পরলোকগত বন্ধুর কথা। কুকুরকে তিনি যমের মতো ভয় করতেন। একদিন আমরা দুজনে জনৈক বি-এন-জি-এস'এর (অর্থাৎ 'বিলেত না যাওয়া সাহেবের') সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মস্ত বড় বাড়ি, সদর দরজা উন্মুক্ত।

যেন আতিথেয়তার মূর্তিমান প্রতিভূ। কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিতে না দিতেই প্রায় মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতো এক ভীমদর্শন অ্যালসেশিয়ান।

বন্ধুটির হাতে ছিল সিগারেটের টিন। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা টুপ করে খসে পড়ল মেঝেতে। তাকিয়ে দেখি, তিনি কাঁপছেন— কবিরা যাকে বলেন ছিন্ন কদলী-পত্রের মতো ঠিক সেই রকম।

কুকুরটি সৌভাগ্যবশত টিন শোঁকায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ল তাই রক্ষা, নাহলে কী হত বলা যায় না। তবে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা দিলেন গৃহস্বামী।

'এই যে, কী খবর?' স্বাগত জানালেন তিনি।

বন্ধুবর টলতে টলতে সামনের চেয়ারে গিয়ে এক বস্তা বালির মতো 'দেহরক্ষা' ক'রে বললেন, 'এক গেলাস জল—!'

গৃহস্বামীর চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। আমি তখন সংক্ষেপে আনুপূর্বিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম তাঁকে। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'কী কাণ্ড! কিচ্ছু বলে না। ও, জানেন, জিম বড় ভালো কুকুর।'

বন্ধুটি ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছিলেন। চাপা অসন্তোষের সঙ্গে তিনি বললেন, 'কুকুরের ভালোত্বে বিশ্বাস রাখাটা একটু বেশি চাহিদা নয় কি?'

'মোটেই নয়!' গৃহস্বামী আনন্দের সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, 'ওরা মানুষ চেনে। ভালো লোকদের ওরা কিছু করে না!'

বন্ধুবর কাষ্ঠহাসি টেনে বললেন, 'বলেন কি? এমন জানলে আমি কখখনো এখানে আসতাম না। এরমত একটা জানোয়ারের

ভালোত্বে অটুট আস্থা, তার ওপর দেখুন, জন্তুটা যদি কামড়ে বসত তাহলে সেই মুহূর্তেই প্রমাণিত হত, লোকটা আমি তেমন সুবিধের নই। আর যাই হোক কুকুরের কাছ থেকে আমি কিছুতেই ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে যাব না!'

এ কথার পর আমরা তিনজনেই বলা বাহুল্য হেসে উঠলাম। কিন্তু গৃহস্বামী যে খুব খুশি হলেন না সেটাও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

বাস্তবিক, কুকুর-প্রীতি মানুষকে এমন অন্ধ করে তোলে যে অন্যে কী ভাবছে না ভাবছে সে বিষয়ে একরত্তিও খেয়াল থাকে না। আমি এমন অনেক ভদ্রলোককে দেখেছি, যাঁরা এমনিতে বেশ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, কিন্তু কুকুরের কথা উঠলে যাঁদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

একজন ভদ্রলোককে জানি, তিনি মস্ত বড় একজন অধ্যাপক এবং শিল্প-সমালোচক। তার বাড়িতে একটি কুকুর ছিল। মোটা-সোটা গোবেচারার মতো চেহারা, তেতসার ড্রইং-রুমে না দেখলে তাকে অক্লেশে নেড়া কুকুর মনে করা যেত। অধ্যাপক গৃহিণী, অর্থাৎ আমাদের বৌদি বলতেন, ভঙ্গ কুলীন—ওর প্রপিতামহের আদি নিবাস ছিল নাকি স্পেন দেশে।

কুকুরটার নাম ছিল সোনা।

প্রায় যখনি যেতাম দেখতে পেয়েছি, সোনা ড্রইংরুমের একটি সোফা দখল করে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু বৌদি বলতেন, ওর মতো দুষ্টু কুকুর নাকি তিনি একটাও দেখেন নি। আর এই 'দুষ্টু' কথাটা বলার সময় তাঁর চোখেমুখে এমন একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটে উঠত যা তাঁর ছেলেমেয়েরাও আদায় করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

সোনার দুষ্টুমির প্রশস্তি শুনে শুনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, সেদিন হঠাৎ চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলাম, 'বৌদি, প'ড়ে পড়ে ঘুমুনো যদি দুষ্টুমীর নমুনা হয় তো আমি নির্ভয়ে বল'ত পারি, সোনার চেয়ে আমি বেশি বুদ্ধিমান।'

অধ্যাপক বন্ধুটি খবরেব কাগজ পড়ছিলেন। আমার কণ্ঠস্বরে ঝড়ের আভাস পেয়ে তিনি বললেন, 'আমার আবার একটা মিটিং আছে। এক পেয়ালা চা পেলে ভালো হ'ত।'

'বলে এসেছি। দিচ্ছে।' বৌদি স্থানত্যাগেব সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ঠাকুরপো, সোনা যে কী ভয়ানক ইনটেলিজেন্ট, নিজে উনি তা দেখেছেন। ওকে জিগ্যেস করুন।'

'সত্যিই ভায়া, ভাবি বুদ্ধিমান!' অধ্যাপক-প্রবর সমর্থন জানালেন তৎক্ষণাৎ।

ভাবলাম, স্ত্রীর ভয়ে বুঝি তিনি সায় দিচ্ছেন। বললাম, 'আপনার ছাত্রদের চেয়ে তো বটেই, তাই না?'

কিন্তু এ রহস্যকে তিনি হাল্কাভাবে গ্রহণ করলেন না। খবরের কাগজ পাশে নামিয়ে রেখে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ডাকলেন, 'সোনা—।'

কুকুরটা যেমন ছিল তেমনি রইল, শুধু চোখ মেলে তাকাল।

'সোনালা!' অধ্যাপকের কণ্ঠে যেন মধু ঝরে পড়ছে।

কুকুরটা একটু ওঠার চেষ্টা ক'রে আবার ভালো করে শুলো।

'সোনিয়া!' বন্ধুর কণ্ঠে যেন বেহাগের মূর্ত বিষাদ।

কুকুরটা মাথা উঁচু করে তাকাল।

'সু—!' হাততালি দিয়ে বন্ধুবর যেন কচি ছেলে ভোলাচ্ছেন. 'সু আসে, সু আসে—!'

অতি অনিচ্ছায় কুকুরটা এবার মন্থরগতিতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

বিজয়ীর মতো সারা মুখ হাসিতে উদ্‌ভাসিত করে অধ্যাপক-বন্ধু বললেন, 'দেখলে তো. কেমন ইন্‌টেলিজেন্ট ?'

'কিংবা ইন্‌সোলেন্ট। ডাকলে নড়তে চায় না।' আমি চাপা বিরক্তিতে বললাম।

'হুঁঃ ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে পারলে না! আদর চায় বুঝলে আদর চায়। আচ্ছা, এই দেখ,' বলে তিনি গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি একটু কথা বল তো?'

অধ্যাপক-গৃহিণী বললেন তখন, 'সোনামণি ঘুম হয়েছে?'

কুকুরটা কুই কুই করে কী বলল বুঝতে পারা গেল না।

আমাদের বৌদি বললেন. 'ও? জলতেষ্টা পেয়েছে? মোহন অ মোহন সোনাকে জল দে'

পরিচারক একটি কলাইয়ের বাটিতে জল আনল। কুকুরটা সেটা শুঁকেও দেখল না।

'ও? রাগ করেছ?' বলে কি বলব স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুকুরটাকে জল খাওয়ানোর জন্যে এমন তোষামোদ শুরু করলেন যে দেখে আমার ব্লাড প্রেসার ধাঁ করে দুশো ছাড়িয়ে বিপদাঙ্কে উঠে গেল। আমি অদম্য বিরক্তিতে ফেটে পড়লাম এবার, 'কুকুর পুষতে পুষতে শেষে যে মানুষই কুকুরের পোষা জানোয়ারে পরিণত হয় তা জানতাম না। নমস্কার!' উঠে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু এতক্ষণ যা বললাম সে হল অন্য কাহিনী। রাস্তার কুকুরের বরাতে এমন সৌভাগ্য স্বপ্নেরও অগোচর। তারা সংখ্যাহীন ভাবে জন্মাবে আস্তাকুড় ঘেঁটে বেঁচে থাকবে এবং তাদের বেওয়ারিশ অস্তিত্ব মানুষের অসহ্য হলে স্থিরমস্তিষ্ক জিঘাংসার হাতে প্রাণ দেবে।

এমন কি বাড়িতে যাঁরা কুকুর পোষেন আদুরে কুকুরটি একবার হাঁচি দিলে যাঁরা ডাক্তার ডাকেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ দেখান না।

অথচ আমার কিন্তু মনে হয়, কামড়ানোর ঘটনা রাস্তার চেয়ে বাড়ির কুকুরের খামখেয়ালিতেই ঘটে বেশি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সে-সব ঘটনা পরিসংখ্যানে স্থান পায় না। ইংরেজী প্রবচনের তত্ত্বকথা অনুযায়ী ফাঁসি যাওয়ার আগে দুর্নাম ভোগ করে শুধু রাস্তার কুকুরগুলি।

## ॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সভাপতি হ'তে কার না ইচ্ছে হয়। আদর-আপ্যায়ন, মালা, জলযোগ এবং সেই সঙ্গে দুচারটে জ্ঞানের কথা বিতরণ করা—এতে সন্ধ্যেটা ভালোই কাটে বলতে হবে। তাছাড়া এত লোকের লক্ষ্যস্থল হ'য়ে আসর জাঁকিয়ে বসা, সেও কম আকর্ষণের ব্যাপার নয়। জীবনে একমাত্র বিয়ের সময়েই লোকে এমন একচ্ছত্র মনোযোগের অধিকারী হ'তে পারে এবং বিয়ে যেহেতু খুব ঘন-ঘন করা যায় না,

সেজন্যে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো সভাপতি হওয়াই সর্বলোকের লক্ষ্যস্থল হওয়ার অদ্বিতীয় পথ।

কিন্তু, দোহাই আপনাদের, আমাকে আপনারা কেউ সভাপতি হ'তে বলবেন না। সভাপতি হওয়ার সাধ আমার জন্মের মতো মিটে গেছে।

আমি জানি, আপনারা আমার কথা একটুও বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন, এ আমার আদর-কাড়ার নবতম উপায়—'আরেকবার সাধিলেই খাইব' ধরনের ব্যাপার। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, তেমন কোনো গোপন অভিসন্ধি নেই আমার। নিছক সেই ধরনের জৈববৃত্তি পণ্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন ইন্‌স্টিঙ্কট্ অব সেলফ্ প্রিজার-ভেশান তারই তাগিদে সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য এ লাইনে আমি নতুন লোক নই। অল্পস্বল্প দুর্ঘটনার ব্যাপার আমার আগেই জানা ছিল। যেমন ধরুন, আমার নাম যদি হয় পরমেশ গুপ্ত, তাহলে অনিবার্যভাবেই সভাস্থলে ঘোষণা করা হবে—আজকের সভার সভাপতিত্ব করবেন পরেশ গুপ্ত কিংবা রমেশ গুপ্ত, কিন্তু কখনোই আমার নিজের নাম নয়। তাছাড়া, কর্মকর্তাদের তরফ থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে যিনি আমাকে সঙ্গদানের জন্য নির্দিষ্ট হবেন, তিনি প্রথমে আমাকে প্রমথেশ গুপ্তের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন, তারপর নিজের ত্রুটির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে জানতে চাইবেন, আমি কোন্ কোন্ বইয়ের লেখক এবং আমার লিখিত বইয়ের নাম শুনে তিনি শুধু সহাস্যবদনে বলবেন - বেশ, বেশ, বেশ!

কিংবা এসব, কিছু যদি নাও ঘটে তো, ধার করে চেয়ে আনা যে গাড়িতে আমাকে প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি, কণ্ঠ-সঙ্গীত-

পরিবেশিকা, তাঁর বাদ্যযন্ত্র এবং তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে প্রায় গুড়ের নাগরির মতো বোঝাই ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে, ফেরৎ দেওয়ার সময়ে সে গাড়ি পেতে যে রাত দশটা বেজে যাবে, এ তো এক রকম স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

তারপর রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধাক্কা। আপনারা যাঁরা সভাপতি হ'য়েছেন, তাঁরা জানেন সভাপতির মতো অসহায় জীব ভূ-ভারতে নেই। কলকাতার বাইরে গেলে দেখা যাবে সভাস্থলের বারো-আনা শ্রোতাই বালকবালিকা। তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করে নাচ-গানের জন্যে এবং নাচগান আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ঠেলা-ঠেলির ফলে যে পরিমাণ কলরব উত্থিত হয়, তাতে সযত্নে সাজানো বক্তৃতারও খেই হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

তবু তাদের সভাপতি চাই। সভাপতি না পাওয়া পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তার আর অবধি থাকে না। প্যাণ্ডেল, মাইক, গায়ক-গায়িকা—সব কিছু ঠিক হওয়ার পরও পছন্দসই একজন সভাপতি খুঁজে না পেলে সমস্ত অনুষ্ঠানটারই যেন মাথাকাটা যায়; কর্ম্মকর্তারা একেবারে মরীয়া হ'য়ে ওঠে।

আমার বন্ধু স-বাবুর কাছে শুনেছি, একবার তিনি শহরতলী থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছিলেন। তাতে ছিল সভাপতি হওয়ার জন্যে ব্যাকুল অনুরোধ। স-বাবু অনেকগুলি উপন্যাসের লেখক, কিন্তু সভার মধ্যে মুখ খুলতে পারেন না। সভার নামে তাঁর বুক ধড়ফড় করে। শরীর ভালো নয় বলে তিনি টেলিফোন-কারীকে নিরস্ত করলেন। কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল হতাশায় ভেঙে-পড়া মন্তব্য (সম্ভবত পাশের কোনো সহকর্মীকে বলা), 'এক ব্যাটাকেও

তো সভাপতি করা যাচ্ছে না !'...ওঁরা টেলিফোনে হাত চাপা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, কাজেই স-বাবুকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে হল নিজের রিসিভারটা !

এইরকমেই এক উদভ্রান্ত আবেদনে সেদিন আমাকে যেতে হ'য়েছিল কলকাতার কাছাকাছি নৈহাটি লাইনের কোনো এক জায়গায়। গিয়ে আমার আচ্ছা আক্কেল-সেলামী হ'য়েছে। আমি তাই স্থির করেছি, জীবনে আর কখনো কারো নাকী-কান্নায় ভুলব না।

ব্যাপারটা খুলে বলি। রাত দশটায় ফাংশন শেষ হবার পর, ওরা আমাকে নিয়ে গেল এক বাড়িতে জলযোগ করাতে। সেখানে চা-খেয়ে এবং জলযোগ না ক'রে ( কারণ ওলাওঠা অতি ভয়ানক ব্যাধি, এবং শুনেছি বাসি খাবার তার উত্তম বাসস্থান! ) অনেক কষ্টে তো আধ ঘণ্টার মধ্যে অব্যাহতি পাওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি আর কিছুতেই আসে না। আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জানা গেল গাড়িটার টায়ার ফেঁসে গেছে। তাহলে উপায়? আছে বৈকি, বাসে ফিরতে হবে। একটি ছেলের সঙ্গে সাইকেল-রিক্সা করে আমাকে রওনা ক'রে দেওয়া হল বাসরাস্তার দিকে। কিন্তু তার কাছাকাছি এসেই দেখা গেল কলকাতামুখী বাস সগর্জনে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। সঙ্গী বলল, এবার স্টেশনে যেতে হবে, কারণ এটা লাস্ট বাস, লাস্ট ট্রেন আসতে আরো মিনিট দশেক দেরি আছে।

সাইকেল-রিক্সা চলতে লাগল। হঠাৎ পিছনে শুনি বাসের হর্ন। কী, না কলকাতা থেকে শেষ-বাস আসছে। সঙ্গীটি তৎক্ষণাৎ ছট্‌-ফট্‌ করে নেমে পড়ল এবং ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল সেই প্রায়-চলন্ত বাসে, বলল—আপনি স্টেশনে যান।

কিন্তু যান বললেই তো যাওয়া যায় না। রিক্সাচালক বলল, সে আর এগোবে না। কারণ ফিরতি পথে একা-একা এলে ছিনতাইয়ের ভয় আছে। ওই তো সামনে স্টেশান, রেল-ইয়ার্ডের ভিতর দিয়ে গেলে পোয়াটাক পথও নয়, ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না।

অগত্যা নামতে হল, ভাড়া দিতে হল এবং ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে আধা-অন্ধকারে ছুটতে হল। হোঁচট খেলাম চারবার, চশমাটা ছিটকে পড়ল, একপাটি জুতোও কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ট্রেন পেলাম এবং বাড়ি এলাম। রাত তখন ১টা। পরদিন একশ চার জ্বর !···

সেই থেকে ঠিক করেছি, আর আমি সভাপতি হব না।

---